

১৪২৮

বড়গল্ল ● ক্যাইজ ● খেলা ● বুকচর্চা

মূল্য ১৫ টাকা

প্রথম সংখ্যা মে ২০২১

আদা

হ্রন্থকে সঙ্গে
ডাক্তা

সম্পূর্ণ
ভুতুড়ে
কমিকস
”মায়া”

প্রবন্ধ

ঠাকুর
ও
প্রেতচন্দ

জয়জয়মাট
অঙ্গুড়ে গল্ল
সংখ্যা

ଆର୍ଦ୍ରା

ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା, ବୈଶାଖ ୧୪୨୮, ମେ ୨୦୨୧

ଆର୍ଦ୍ରା ପତ୍ରିକା ସଦସ୍ୟରା

ଶୁଭଜିଃ ମୁଖାର୍ଜୀ

ଅଙ୍କନ ଦନ୍ତ

ଅଞ୍ଚୁର ଦନ୍ତ

ଅର୍କଜ୍ୟାତି ବିଶ୍ୱାସ

ସୌମ୍ୟଦୀପ ଭଟ୍ଟାଚାର୍

ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଅଲଂକରଣେ

ଅର୍କଜ୍ୟାତି ବିଶ୍ୱାସ

ଠିକାନା

ଡାକଘର - ଆଦ୍ରା,

ଜେଳା - ପୁରୁଣିଯା,

ପିନ ନଂ - ୭୨୩୧୨୧

ଆମାଦେରକେ
ଲେଖା ପାଠୀତେ ପାରେନ e-mail
ଆଥବା facebook page ଏ

E - mail id:

ardraemagazine@gmail.com

Facebook Page:

<https://www.facebook.com/Ar draemag/>

ବିଷଦେ ଜାନତେ follow କରନ୍ତୁ

ଆମାଦେର Website:

<https://ardramag.wordpress.com/>

- ସୂଚିପତ୍ର -

ଗଲ୍ଲ

ପ୍ରାୟଶିତ୍ତ - ପାପଢ଼ି ମଣ୍ଡଳ

କଥା ରେଖେଛି - ଅଙ୍କନ ଦନ୍ତ

ଶଚୀନ ବାବୁର ବାସା - ଦେବାଶୀଷ ଦନ୍ତ

ଅଥ : ପିଶାଚ ଚରିତମ - ଶୁଭଜିଃ ମୁଖାର୍ଜୀ

କ୍ଲାବଧର - ଆଲିମ୍ପନା ଦାସ

ଖୁକୁର ଭୂତ - ଅଜୟ ଗାନ୍ଧୁଲୀ

ଅନ୍ତ୍ରୁତ ଭୂତ - ଦୁଃଖିତ ରଜକ

ଜୀବତ ପୋଟ୍ରେଟ - ଅନିନ୍ଦିତା ବ୍ୟନାର୍ଜୀ

ତ୍ବୁ ମନେ ରେଖୋ - ଅଭୀକ ସେନ

ତାରାୟ ତାରାୟ ରାଟିୟେ ଦେବୋ - ପ୍ରେମାନ୍ତପଦ ଭରଦ୍ଵାଜ

ଅଭିଶପ୍ତ ମାରିପୋସା - ରିମା ମାନ୍ଦା

ପେନ୍ତୀର ଇନ୍ଟାରଭିଡ୍ - ଅମଲ ମାଜୀ

ବିଦେଶୀ ଗଲ୍ଲ “ଆଙ୍ଗୁଳ” - ଏଲଭିନ ସୋଯାଂର୍ଜ

କବିତା

ପ୍ରବନ୍ଧ

ଆଁକାର ପାତା

ଫଟୋଗ୍ରାଫିର ପାତା

କୁଝିଜ

ଖେଲାର ପାତା

କମିକସ

আর্দ্রা পত্রিকার প্রথম সংখ্যা উৎসর্গ করা হল

প্রিয় শিক্ষককে



শ্রী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

(১৯৬৫ – ২০১৯)

সম্পাদকীয় :



" হায় বাঙালী হায়
তুই আর বাঙালী নাই
তোর চলন বলন
কথার ধরন নিজের মত নাই
ও তুই আর বাঙালী নাই। "



ই টিভি বাংলা কিম্বা তারা বাংলায় সকাল সঙ্গে তখন প্রায় এই গানটা শোনা যেত। খরাজ মুখাজীর কষ্ট আর অভিনয় এই গানটিকে এক অন্য মাত্রা দেয়। তখন বুরিনি, কিন্তু এ কাল যাবৎ এই গানটির প্রাসঙ্গিকতা যে কতটা, তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছ। রোজ সকাল বেলা ঘুম ভাঙা চোখে মনে মনে প্রার্থনা করি যেন বাংলার ভাগ্যদেবতার চিরকালীন উত্তরায়ণ না ঘটে নইলে উদাসীন বাঙালী জাতির শেষ ঠাঁই হবে রেড ডাটা বুকে বাকি বিলুপ্তপ্রায় জীব প্রজাতির সঙ্গে একই তালিকায়। তাছাড়া বাঙালীর তো আলাদা করে কোন বিজ্ঞানসম্মত নাম নেই, কাজেই কেই বা মনে রাখবে।

আমি পুরুলিয়া জেলার আদ্রা নামক একটি ছোট রেলশহরের বাসিন্দা। একদিন ট্রেনে বন্ধুদের সঙ্গে আসানসোল যাওয়ার পথে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হই। একজন মাঝবয়সী অবাঙালী ভদ্রলোক সপরিবার যাত্রা করছিলেন। অনধিকারে সিটের বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে বসেছিলেন তিনি, তার স্ত্রী আর তাদের দশ বছর বয়সী ছোট মেয়ে। আমি তার কাছে অনুরোধ করি একটু জায়গা ছেড়ে আমার এক বন্ধুকে বসতে দেওয়ার জন্য। না তিনি জায়গা দেননি, উপরস্তু জোর গলায় ট্রেনভর্তি

লোকের সামনে চিৎকার করে খুব সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন - " বাঙালী আছে, বাঙালীর মতো থাকবে। " ট্রেনের পুরো কামরা চুপ। কেউ কোন প্রতিবাদ করেনি আমি ছাড়া। বুঝিনি বাঙালীর মতো থাকাটা ঠিক কী ? তবে সেদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে গোটা দেশজুড়ে বাঙালী তথা বাংলার ভাবমূর্তিকে বিকৃত করার জন্য যে দক্ষযজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে, তার আগ্নে যাতে আর একফোঁটাও ঘি না পড়ে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। শুরু হল এক বিজ্ঞান বিভাগের ছেলের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পথে পাড়ি দেওয়া। তবে সে পথ সহজ ছিল না মোটেই। আমি কোন কিছুই জীবনে সহজে পাই নি , লড়াই করতে হয়েছে। মতি নন্দীর লেখা 'কোনি' সিনেমাটা মনে আছে ? ক্ষিদ্বার চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সংলাপের সেই চিরস্মরণীয় অমোহ বাণী - " ফাইট , কোনি ফাইট ! "

শুরু হল দাঁতে দাঁত চেপে সংগ্রাম। কুন্ডু প্রেসের কাকুকে কোনদিন ভুলব না , পুজোর আগে শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি নিয়েছিলেন এই মহার্ঘ দায়িত্ব। আমার শুকনো মুখ দেখে হয়তো মায়াই হয়েছিল তাঁর। এরপর চাপলো আরেকটা বোৰা , অর্থের। টিউশন পড়ানোর টাকা জমিয়ে রেখেছিলাম , সেটা ভেঙে দিলাম। সেবার পুজোয় এল ' উষসী '। বিপদকালে পাশে পেলাম রঙ্গনাদি (রঙ্গনা চৌধুরী) আর মামণি (শ্রীমতী লেখা ঘোষ) - কে , সাহায্যের হাত বাড়িয়ে হলেন " উষসীর " শিরদাঁড়া।

সব সমস্যা প্রায় মিটে গেল , কিন্তু সার্কুলেশন ? কে করবে?

পাশে পেলাম একজন পুচকে সাহিত্যপ্রেমী ভাইকে। বয়সে যদিও সে অনেক ছোট কিন্তু সাহিত্যের বাসায় তার অবাধ বিচরণ। অঙ্কন। দায়িত্ব নিয়ে ' উষসী ' পোঁচে গেল ঘরে ঘরে। পাশে পেলাম আমার স্কুলের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাদের। স্কুলের বাইরেও যিনি আমাকে ছোটবেলা থেকে জীবনে সবরকম পরিস্থিতির মোকাবিলা করার

উপায় বাতলেছিলেন , তিনি দীপিকা ম্যাডাম। বলেছিলেন - " অহং এনো না ,
জানবে বিনয়ী ব্যক্তিই মহান , তোমার কাছে এমন কিছু রেখো , যা রয়ে যাবে
চিরকাল।" তাঁকে শুধু একথাই বলতে চাই , আমি কিছু ভুলিনি। মাতৃকাসনে
বসিয়েছি চিরকাল। হয়তো কোনজন্মে আপনি আমার মা ছিলেন। নয়তো এমন করে
কে আমায় ভালোবাসে ?

এবার যার কথা বলবো , তাকে ছাড়া এ গল্প সম্পূর্ণ হয় না, হতে পারে না। এঁর
মতো মানুষের দেখা মেলা এ জগতে ভার। আমার সত্যজিৎ কাকু (সত্যজিৎ
চ্যাটার্জী)। যখনই সমস্যার কালো মেঘ ঘিরেছে আকাশ , তখনই একচুটে কাকুর
ছায়াতলের আশ্রয়ে। টিলেটালা অকৃতদার এই মানুষটার প্রতি আমার এক অন্যরকম
শ্রদ্ধা রয়েছে। কত গল্প !! কত অভিজ্ঞতা !! সেসব শুনতে শুনতে সময়পাখি যে
কখন ফুড়ুৎ , বোঝাই যায় না। যত জটিলই হোক প্রশ্ন , তার উত্তর স্বয়ং
সত্যজিৎ কাকু। সাধে কী আমি বলি - তুমিই শুশানচারী তৈরব। সব কিছুর মাঝে
থেকেও যেন সবকিছুর উদ্বো। এই সোজাসাপটা অকপট মানুষটার প্রতি আমার
সশ্রদ্ধ প্রণাম। জীবন কমবেশী পাওয়া না পাওয়া মধ্যে দিয়েই এগোয়। ভালো মন্দ
সবাইকে সঙ্গী করে দাবি বলতে শুধু এক মুঠো অক্ষিজেন। আমি আর অঙ্কন যখন
"উষসী"- র দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশের কথা ভাবছি। চড়া রোদ মাথায় নিয়ে বাজার
ঘুরে বিজ্ঞাপন জোগাড় করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছি তবু কেউ একটা টাকাও দিতে
রাজি নয় , শুধু স্টুডেন্ট চয়েসের রোমিদা সাহায্য করলেন সাধ্যমতো।

কিন্তু বিধি বাম। মানবজাতির ধ্বংসবিলাসী রূপরূপে নেমে এল করোনা মহামারি।
আমরা তখন শুধু খবরের কাগজে আক্রান্তের আর মৃতের সংখ্যা গুনে যাচ্ছি। কেন্দ্র
লকডাউনের ঘোষনা করল। সব বন্ধ। ছোট ছোট ব্যবসাদারদের চোখে তখন
অঙ্ককার। পরিযায়ী শ্রমিকদের অনেকে দীর্ঘদিন অনাহারে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তাতেই

প্রাণ হারালো, তাদের আর ঘরে ফেরা হলো না। কত মানুষের রাতারাতি চাকরি চলে গেল। আমরাও আমাদের উদ্যোগ স্থগিত রাখতে একপ্রকার বাধ্যই হলাম। ঘরের চারদেওয়ালের মধ্যে কাটছিল আতঙ্কের দিনরাত্রি। গত বছর পুজোর সময় ধীরে ধীরে ঘৰন লকডাউন উঠলো, তখন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। অঙ্কনকে বললাম আবার কাজ শুরু হোক। অঙ্কনও রাজি হয়ে গেল। শুরু হলো নতুন লেখক লেখিকাদের লেখা জোগাড় করা। দুজন থেকে আমরা হলাম পঞ্চপান্ডব ; আমি, অঙ্কন, অঙ্কুর , সৌম্য আর অর্ক। সবাই যে যার দায়িত্ব বুঝে জোরকদমে কাজ শুরু করলাম। আমাদের লোকবল বাড়াতে কাজ করতেও সুবিধে হল। এবার ভাবলাম পত্রিকাটার নাম কী রাখা হবে, কারণ তার অনেক আগেই বুবান মামা (ক্রফেন্ডু দত্ত) "এবং উষসী" নামের পত্রিকা কোলকাতা থেকে প্রকাশ করেছেন , তাই আমাদের দল ঠিক করলো পত্রিকার নাম পাল্টানো বিশেষ প্রয়োজন। সারারাত নানারকম নাম নিয়ে মগজধোলাইয়ের পর অবশেষে আমি " আর্দ্রা " নামটা রাখি। এই নামটাই রাখার অন্য কোনো বিশেষ কারণ নেই। তবু বলে রাখি আর্দ্রা (ইংরেজিতে Betelgeuse) আকাশের কালপুরুষ নক্ষত্রমন্ডলভুক্ত একটি তারা। আর্দ্রা আকাশের অষ্টম এবং কালপুরুষ নক্ষত্রমন্ডলের দ্বিতীয় উজ্জ্বল তারা। এর ঋগ্বেদীয় নাম 'রুদ্র' আর সৈদ্ধান্তিকরা ডাকে 'আর্দ্রা' নামে। এই তো গেল পত্রিকার নামকরণের ইতিহাস। শুরু হল নতুন আঙ্কিকে এক সদ্যজাত পত্রিকার পথ চলা। লক্ষ্য হলো বাংলা ভাষাকে যত্নে বাঁচিয়ে রেখে বিশ্ব বাঙালীর মানস দরবারে বিশেষ জায়গা করে নেওয়া। যাতে আজকের ই - পত্রিকা থেকে একদিন 'আর্দ্রা'- র নতুন বাঁধাইয়ের কপি মানুষ হাতে নিয়ে এর গন্ধ নিতে পারে। পুরুলিয়ার এক ছোট শহরের পাঁচজন যুবকের এই যাত্রার গন্তব্য যে ঠিক কোথায় তা ঠিক করবেন আপনারা। দুই বাংলার বুকে নতুন নতুন প্রতিভাদের যোগ্য আসন পাইয়ে দেওয়ার লড়াইয়ে আমরা আছি,

থাকব। জানি না কাল কী হবে ? জানি না এই পত্রিকা ঠিক কতটা প্রভাব ফেলবে
বাঙালী চিন্তনে , তবু যবনিকা না টানা অব্দি নাটকের শেষ অঙ্কটা মিলিয়ে যাব ,
যাতে দর্শকাসনের লাস্ট সিটে বসা মানুষগুলোর হাততালিও কর্ণগোচর হয়।
ভালোবেসে বাঁচুন আর ভালোবাসতে শেখান, কারণ বাঙালী তো বাঙালীর মতোই
থাকবে।

আজ এখানেই শেষ করলাম। আর্দ্রা পত্রিকার প্রথম সংখ্যা কেমন লাগল অবশ্যই
জানাবেন। আমাদের চিঠি পাঠাতে পারেন ই মেল ঠিকানায়। আপনাদের প্রতিক্রিয়ার
অপেক্ষায় রইলাম।

ধন্যবাদাত্তে

আর্দ্রা পত্রিকা পরিবার



ভূত ডট কম

মদন চক্ৰবৰ্তী

অমাৰস্যাৰ গভীৰ রাতে
যেওনা গো সে পথে,
ভূতেৰ পিসে দাঁড়িয়ে আছে
ত্যালানো লাঠি হাতে।

বাবৰি কালো চুল তার
মূলোৱ মতোন দাঁত
কান দুটো তার কুলোৱ মতন
সৱু প্যাকাটি হাত।

গায়েৰ বৱণ পিচেৰ মতন
দুই চোখ গোল গোল
এদিক ওদিক ঘোৱায় কেবল
ডৱে সে হৱিবোল।

দেখতে পেলে কাছে ডাকে
হিসহিসে গলা ঝেড়ে
দৌড়ে এসে কামড়ে ধৱে
হাতেৰ কাছে পেলে।

ভুতুড়ে দাশনিক

অভিজ্ঞপ চাঁদ

পুৱাতনে পড়লো ছ্যাঁকা
সত্য নাকি মিথ্যে দেখা
ঘুম জড়ানো চাদৰ ছেড়ে
খাটেৱ নিচে ঘাপটি মেৰে
ঘুৱছে যেন মত ক্ষ্যাপা
কাটা মুন্ডু বগল চাপা।

আবছা আলোয় জোনাক জুলে
হিচকি বারেক নালিশ করে
শিৱদাঁড়াতেও বৱফ নামে
নিজেৰ বুদ্ধি ফুৱায় ঘামে।

হদিশ তাহার কেউ না জানে
নাম নেয় না ভীষণ মানে
সারারাত্তিৰ স্বপ্ন জুড়ে
দেত্য ভূতে নেত্য কৱো।

সাহস বেহোশ

অনল অধীশ

জানলা ফাকে তীক্ষ্ণ স্বরে
করছে যিবি চিৎকার,
ঘুটঘুটে ঘর মোমের আলো
বেশ ভুতুড়ে ব্যাপার।

বইছে বাযু শিরশিরিয়ে
দিচ্ছে গায়ে কঁটা,
হচ্ছে মনে মারছে মাথায়
মামদো বাবু চাটা।

মা যে বলে রাম বললে
ভূতেরা ভয় পালায়
এতো দেখি পেত্তী নাচে
আমার বাড়ির চালায়।
রান্নাঘরে আওয়াজ শুনি
হয় বুঝি বা মেছো,

নিম গাছেতে পা দুলিয়ে

হয়তো বসে গেছো।

ভয়তো আমি তাও পাইনি

সাহস ভরা বুক,

অঙ্কা পেলাম মেঝেয় দেখে

স্কন্দকাটার মুখ।



শুনশান রাত

বর্ণা দে

চোখের পাতায় ঘুম আসেনা
 স্বপ্নরা রাগ দেখায়,
 কাগজ-কলম রাতের দেশে
 ভূতের ছড়া লেখায়।

বাজছে তখন রাত দশটা
 বাড়ির পেছনে বাস,
 পৌষের রাতে ভাবছি হবে কি
 পৌষ এই সর্বনাশ?

কানাভেজা একটি গলা
 ভেসে এলো মোর কানে,
 গিয়ে দেখি কেউ নেই দাঁড়িয়ে
 ঠান্ডা হাত যেন পিছু টানে।

সেদিন হাওয়ায় বইছিল এক
 দৃষ্টি রত্নের গন্ধ,
 আমার মনে চলছিল শুধু
 আসল নকল দ্বন্দ্ব।

রাত নেমে এল ঘনিয়ে
 চারপাশ বেশ শুনশান
 ভয়ে-আতঙ্কে কোনক্রমে
 রাতের হল অবসান।



ভূতেদের ব্যান্ড

সাত্যকি দে

পচাদের গ্রামে নাকি

ভূতেদের রাজ্য

ব্যান্ডে গায় গান

বেসুরো অখাদ্য।

হারমোনিয়ামে বাজায়

মামদো সারেঙ্গী

মেছো শুধু মারে তালি

পড়ে কাটা গেঞ্জি।

উন্টট গলা নিয়ে

গায়ে শাকচুনি

ভাবে কত জনমে

করেছে সে পুণ্য

এই ব্যান্ডের যে

আজ লিড সিঙ্গার

মাছ খেয়ে দাঁত খোটে

দিয়ে সরু ফিঙ্গার।

ওই যে মোটা ভূত

সেই নাকি ম্যানেজার

এই বাড়ি সেই বাড়ি

ঘোরে সে আকছার।

গান্টান কচু জানে

খাওয়াটাই ধান্দা

আজ ভাজা মাছ দিয়ে

হয়ে যাক পান্তা।

ওই যে বেঁটে ভূত

সে হল ফঁকিবাজ

গান লেখা তার কাজ

সেই নাকি মহারাজ!

এই নিয়ে চলে বেশ

ভূতেদের ব্যান্ডটা

বাকি ভূত করে নাচ

নিয়ে সরু ঠ্যাংটা॥



পাপুর ভূত অভিযান!

সোমদীপ কুন্ডু

‘ভূত কে নিয়ে পদ্য ছড়া

ভারি কঠিন তৈরি করা’।

তাই ভাবলাম ভূতের নামে

চালিয়ে দি অন্য কিছু।

‘ভূত কি জিনিস? কোথায় থাকে?’

ছোটো পাপু করলো জিজ্ঞেস মা কে

মা বললে ‘দেখিস নি কো?

এখানেই তো থাকে!’

শুরু হলো ভূত অভিযান

কেও বলে দুপুর ছাদে তাদের বাড়

কেও বা বলে, ‘সন্ধা পরে

কবরস্থান যাসনেকো, মটকে দেবে ঘাড়!’

পাপুর বড়েড়া সাহস ছিল

খুঁজতে গেলো সেদিন রাতেই

যেই না চুকে গেট পরিয়ে

খড় খড়া খর শব্দ এলো।

চমকে উঠে পিলে পাপুর

তবু মানবেনা হার!

দুপা এগোয় যেই না সে

ওমনি এলো তেড়ে।

চার পা ওয়ালা কালো কুচকুচে

ওরে ওটা ভূত না,

জংলী শুয়োর নালায় চুকে

করছিল চিল ভিজে।

পাপু তো সে রেগে গরম

মা কে বলে, তোমার জ্বালায়

ভূত খুঁজতে গিয়ে, মরবো কবে

গুত খেয়ে, গরুর শুয়োর বা মাড়িয়ে সাপ!

মা বলে বড়ো করণা মেখে
ওরে পাগল ছেলে,
ভূত কি ওমনি থাকে নাকি
মাঠে বা জঙ্গলে?

কোন ভূতে তে আগুন জ্বালায়?
বন জঙ্গল পুড়েই ছাই
জঙ্গলে যদি তার নিজের বাড়ি
সে কি এমন করতে চায়?

যারা তোকে দেয় ঠিকানা
ছাদের ঘর বা কবরখানা।
ভূত যে তাদের মনেই আছে
এইটুকুও বুঝিসনা?

অনেকক্ষন চুলকে মাথা
পাপু খুললো মুখ
'ভূত যে আছে এই সমাজেই মিশে,
করতে হবে 'শিক্ষা' নামক বাড়ফুঁক।'

অথবা যারা, বিয়ের আগে
নিচে পণ ভুরি ভুরি
তাদের বুঝি ভূত ধরেছে?
এ তো আর কিছু নয়, চুরি!

কিঞ্চিৎ যারা ধর্মে পাগল
মারছে মানুষ, জ্বালায় বাড়ি
বলতো পাপু সত্য করে, কোন
ভূত আছে তাদের মাথায় চড়ি?



ভুত সিটিতে ভুবন দাদা

সুমিত কুমার বেরা

মামদো ভুতের সঙ্গে ছিল শাঁকচুনীর সিস্টার,
বললো ডেকে ভুবনদাকে যাচ্ছে কোথায় মিস্টার ?

গেটপাশ না থাকলে তোমার লাগবে এবার ফাইন,
ভুত সিটিতে এন্টি নেওয়ার এটাই লেটেস্ট আইন ।

এইনা শুনে ভুবনদাদার মেজাজ গেল বিগড়ে,
রাগের চোটে বাগিয়ে হাতা ধূতির কোঁচা নিগড়ে-
চড়িয়ে গলা সপ্তমেতে বললো উইল ইউ স্ট আপ,
ফাস্ট নাইটেই দেখতে হবে ভুত মহলের গেটআপ।

আজকে রাজার বার্থডে পার্টি সব হওয়া চাই আর্লি,
আসবে রাজার ফেসবুক ফ্রেন্ড চাউমিন এন্ড চার্লি ।

অ্যাংলো ভুতের বাংলো থেকে আনতে হবে ডিজে,
অনুষ্ঠানের অ্যাংকারিং -এ থাকবো এবার নিজে।
পেত্রিয়া সব নাচবে আবার চলবে গানের ফাইট,
পাতার ফাঁকে জ্বালতে হবে জোনাক পোকার লাইট।

সেই লাইটে দেখবো বলেই চোখ রেখেছি ওকে,
বাইনোকুলার চাইনা আমার জানিয়ে দিলাম তোকে!

কিন্তু ব্রাদার ভুল করলে রিস্ক আছে তার হেভি,
 এক নিমিষেই চটকে ঘিলু বানিয়ে দেবে গ্রেভী।
 এইতো সেদিন চালাচ্ছিলাম শাঁকচুনীর সালসা,
 সাডেনলি কেউ মারলো ছুঁড়ে ফিফটি কেজির মালসা।
 দিতেও হলো ডাঙ্গার কে ফাইভ হান্ড্রেট মানি,
 তবুও কি আর পেত্রির ডান্ড মিস করা যায় হানি!
 এইনা শুনে মামদো ভুতের মুখটি হলো ব্যাজার,
 এক ফাইটেই কমিয়ে দিল ভুট্টা দাদার মেজার।
 দাদার এখন হাইটটা তাই ওনলি টু এন্ড হাফ্ ;
 ভুতের কথা শুনলে পরে লাগায় থ্রি ফিট লাফ।





ପ୍ରାୟ ଶିତ

ପାପଡ଼ି ମନ୍ଦଳ

(১)

গভীর রাত। সময়টা বর্ষাকাল। সারা সন্ধিয় মেঘভাঙ্গা বৃষ্টিতে স্নান করেছে শহর। রাত গভীর হওয়ার সাথে সাথে বৃষ্টির তেজ কমেছে কিছুটা। কিন্তু এখনও থামেনি। বাইরে একটানা বৃষ্টির একঘেয়ে শব্দ শোনা যাচ্ছে। তার সাথে ঝিঁঝির ডাক যোগ্য সঙ্গত করছে। বাড়ির সকলেই ঘুমিয়ে। পিছত যথাসময় নিজের ঘরে ঘুমোতে গেছিল। বেশ কিছুদিন হল এখানে মাসিমার বাড়িতে এসেছে সে। আসলে তারা বহুদিনের প্রবাসী বাঙালি। এখানে একটা নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতে স্নাতকোত্তর পড়ার সুযোগ পেয়েছে। মাসিমার অনুরোধেই সে তাঁদের বাড়িতে এসে উঠেছে।

কিন্তু পিছ ঘুমের মধ্যেও কিছুটা অস্বাভাবিক আচরণ করছে। তার মুখভঙ্গি পাল্টে যাচ্ছে। দুহাতে আঁকড়ে ধরছে বালিশ, বিছানার চাদর। যেন কোনো দৃঃস্বপ্ন দেখছে সে।

পিছ ছটপট করছে ঘুমের ঘোরেই। কয়েকমূহূর্ত পর একটা অস্ফুট চিংকার করে উঠে বসল বিছানায়। কী ভয়ংকর! আতঙ্কে হাঁপাচ্ছে পিছ। হাঁ করে বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছে। যেন এখনি দমবন্ধ হয়ে যাবে তার। পরনের রাতপোশাক ঘামে ভিজে লেপ্টে গেছে শরীরের সাথে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কোনোরকমে বেডসাইড টেবিল থেকে জলের প্লাস্টা হাতে নিল সে। হাতটা কাঁপছে বিশ্বীভাবে। আরেকট হলেই জলসমেত প্লাস্টা মাটিতে পড়ে খান খান হতো।

একচুমুকে পুরো ঘাসটা খালি করে দিল সে। সেটা রেখে দিয়ে থীরে থীরে আবার বালিশে মাথা রাখল। কিন্তু আতঙ্কের রেশ কাটছে না। আজ রাতে আর ঘুম আসবে না।

প্রায় প্রত্যেক রাতে এরকম দুঃস্বপ্ন দেখছে সে। দুটো দৃশ্য ঘুরে ফিরে আসে তার স্বপ্নে। মনে পড়লেই একরাশ আতঙ্ক ঘিরে ধরে তাকে।

কোনো রাতেই পর্যাপ্তপরিমাণে ঘুম হচ্ছে না তার।

(২)

----"পিছ, তোমার কি শরীরটা আবার খারাপ হচ্ছে? ডাক্তারবাবুর কাছে যাবে একদিন?" সকালে জলখাবার খেতে বসে পিছকে জিজ্ঞাসা করলেন তার মেসোমশাই পিনাকীবাবু।

প্লেটের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে না জানালো পিছ।

পিছর মাসিমা ইন্দ্রাণীদেবী লক্ষ করছেন পিছর শারীরিক অবস্থা আবার ক্রমাগত অবনতির দিকে যাচ্ছে। মেয়েটার মুখটা দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। চোখের তলায় একপোঁচ কালি। দৃষ্টিতে কখনও অবসাদ। কখনও বা আতঙ্ক। থীরে থীরে তো সুস্থ হয়ে উঠছিল মেয়েটা। আবার এরকম হয়ে যাচ্ছে কেন? কোনোকিছু কি তার মনের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে? এভাবে আর পিছকে দেখতে পারছেন না তিনি। তিনিই পিনাকীবাবুকে বললেন পিছকে আরেকবার ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যেতো ইন্দ্রাণীদেবী পিছর মাথায় সন্নেহে হাত রেখে বললেন,

----"ডাক্তারবাবুর কাছে যা মা, দেখবি সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে।"

পিছ কোনো উত্তর না দিয়ে তার চোখ দুটো তুলে তাকালো ডাইনিংরুমের
অপরপ্রান্তে উপস্থিত একটা বন্ধ ঘরের দিকে।

(৩)

মালঞ্চ ক্লাসে তুকেই দেখল তার বান্ধবীরা একজোট হয়ে বসে কিছু একটা নিয়ে
আলোচনা করছে। সে এগিয়ে গিয়ে হাসিমুখে তাদের জিজ্ঞাসা করল,

----"কী নিয়ে এতো জটলা করছিস?"

----"তুই কাল কলেজে আসিসনি তাই না?" কীর্তি জিজ্ঞাসা করল তাকে।

----"নাহ, কেন বলতো?" মালঞ্চ কিছুটা অবাক হলো।

----"সোমরাজ স্যারকে তো তুই এখনও দেখিসনি তাহলে।"

----"যিনি নতুন জয়েন করেছেন?"

----"হ্যাঁ।"

----"তাঁকে নিয়ে আলোচনা করার মতো কী হয়েছে?"

----" ক্লাসে এলে তুইও বুঝতে পারবি।" কীর্তির কথা শেষ হতে না হতে ক্লাসের
ঘণ্টা পড়ল। মালঞ্চ বেঞ্চে বসে বই খাতা বের করল ব্যাগ থেকে।

সোমরাজ স্যার রেজিস্টারের মোটা খাতা নিয়ে ক্লাসে তুকলেন। ক্লাসের মেয়েরা তাঁকে দেখেই নিজেদের মধ্যে চাপা গুঞ্জন শুরু করল। মালঞ্চ তাঁর দিকে তাকিয়ে বুকতে পারল একটু আগে কীর্তির বলা কথাগুলোর অর্থ কী। সোমরাজ স্যারকে দেখলে কার্তিকের মনুষ্যরূপ বলে ভ্রম হতে পারে। মালঞ্চ বর্তমানে ফিলোসফি অনার্সের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। কিছুদিন আগে তাদের কলেজের এক প্রবীণ অধ্যাপক অবসর গ্রহণ করেছেন। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল তাঁর স্থানে নতুন একজন অধ্যাপক জয়েন করছেন। মালঞ্চের ধারণা ছিল না তিনি এতো অল্লবয়সী হতে পারেন।

তাঁকে দেখে মেয়েদের মাথা ঘুরে যাওয়াই স্বাভাবিক। বয়স পঁচিশ-ছাবিশ। গৌরবরণ, প্রায় ছয় ফুটের কাছাকাছি উচ্চতা। মেদহীন সুস্থাম চেহারা। চোখ-মুখের গঠন সত্যিই অতুলনীয়। একমাথা কালো কোঁকড়ানো চুল, প্রশস্ত কপাল, ক্র দুটি নিপুণ শিল্পীর হাতের তুলিতে আঁকা। তার নীচে দুটি উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত, গভীর চোখ। অতলস্পর্শী। সামনের বেঞ্চেই বসার কারণে আফটার শেভ লোশন আর জেন্টস পারফিউমের মিশ্রিত মৃদু পুরুষালি সৌরভ ঝাপটা মারল মালঞ্চের নাকে।

মালঞ্চের পর্যবেক্ষণশীল দুই চোখ দ্রুত জরিপ করে নিল তাঁকে। তারপর তার চোখ স্যারের ওপর থেকে সরে এসে নিবন্ধ হলো বইয়ের পাতায়।

স্যার শুধুই রূপে নন, গুণেও অনন্য, তার প্রমাণ পেল সে একটু পরেই। রোলকল শেষ হওয়ার পর তাঁর গমগমে পুরুষকষ্ঠ পাঠ্যপুস্তকের সীমা ছাড়িয়ে বিষয়ের আরো গভীরে পৌঁছে দিল তাঁর ছাত্রছাত্রীদের। মালঞ্চ মুঞ্চ হলো তাঁর জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় পেয়ে।

দ্রুত নোট করে নিল তাঁর কথাগুলো, সে জানে এই তথ্যগুলো পাঠ্যপুস্তক বা ইন্টারনেটে পাওয়া যাবে না। কিন্তু পরীক্ষার সময় এই তথ্যগুলো বেশি মার্কস আনতে সাহায্য করবে।

এরপর থেকে মালঞ্চ প্রতিদিন তাঁর ক্লাসের অপেক্ষা করত।

(8)

সোমরাজ নিজের ঘরে বসে পরীক্ষার খাতা দেখছিল। কলেজের ইন্টারনাল পরীক্ষার খাতা। সেকেন্ড ইয়ারের। অধিকাংশই গতানুগতিক লিখেছে। প্রথম সারির কয়েকজনের লেখা বেশ চোখে পড়ার মতো। তার মধ্যে সেরা এই মেয়েটি। মালঞ্চ রায়।

তার উত্তরপত্র পড়ে বোঝা যাচ্ছে সে ক্লাসে তার কথা মন দিয়ে শোনে। মনোযোগী ছাত্রীর সন্ধান পেয়ে সে খুশিই হলো। সে বুঝতে পারল এটা মালঞ্চের উন্নতির প্রথম ধাপ। আরো উন্নতি অপেক্ষা করছে তার জন্য। আর সেজন্য প্রয়োজন আরো পরিশ্রম। শিক্ষক হিসেবে তাকে উন্নতির সঠিক পথপ্রদর্শন করা তার কর্তব্য।

(৫)

একটা ক্লাস ফাঁকা পাওয়া গেছে আজ। ক্লাসের সকলেই হই হল্লোড়ে মেতে গেছে। মালঞ্চ এই অবসরে ক্লাস থেকে বেরিয়ে লাইব্রেরীতে এলো। সোমরাজ স্যার বেশ কয়েকটা বইয়ের নাম বলেছেন তাকে। সেখান থেকে কিছু বিশেষ তথ্য পাওয়া যাবে।

বইগুলো নিয়ে সে একটা বেঞ্চে এসে বসল। পড়তে পড়তে বুঝতে পড়ল স্যারের কথা একেবারে নির্ভুল। অত্যন্ত তথ্যসমৃদ্ধ বইগুলি। তার নোটগুলোকে সমৃদ্ধ করে তুলতে এই বইগুলো একবারে যথোপযুক্ত। মনে মনে স্যারকে ধন্যবাদ জানাল সে। খাতায় দ্রুত লিখে নিল প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি। যে বইগুলো থেকে লেখা সম্পূর্ণ হলো না, সেগুলো গ্রন্থাগার থেকে ধার হিসেবে নিয়ে এলো।

কলেজ শেষে বাড়ি ফিরে হাতমুখ ধুয়েই স্টাডি টেবিলে বসে পড়ল বইগুলো নিয়ে। জ্ঞানের ভাণ্ডারের সঞ্চান পেয়েছে সো। পড়া শেষ না করা অবধি শান্ত হতে পারছে না।

তার মা এসে হালকা জলখাবার রেখে গেলেন সামনে। সেটা ঠিক সেরকমভাবেই পড়ে রইল। মালফোর তখন হঁশ নেই। সে পুরো ডুবে গেছে বইয়ের মধ্যে।

প্রায় ঘটাখানেক পরে তার মা এসে দেখলেন সে একটুও খাবার মুখে তোলেনি। যথারীতি মায়ের বকুনি খেয়ে খাবারটা সে কোনোরকমে নাকে মুখে গুঁজে আবার ডুবে গেল পড়ায়।

প্লেটটা সরিয়ে নিয়ে যেতে যেতে তার মা একবার ঘুরে দেখলেন তাকে। যেন গভীর তপস্যায় মগ্ন কোনো তাপসী। টেবিল ল্যাম্পের আলো তার চারিদিকে একটা জ্যোতির্বলয় তৈরি করেছে।

সারা সন্ধ্যে পার করে সে বইগুলো পড়া শেষ করল। অনেক রাত হয়ে গেছে তখন। মা দু'বার ডেকে গেছেন রাতের খাবার খাওয়ার জন্য। এবারে না গেলেই নয়।

ল্যাম্পটা নিভিয়ে সে ডাইনিং রুমে এসে চেয়ারে বসল।

(৬)

সেমেষ্টার পরীক্ষা সামনেই। নিজের প্রস্তুতির ওপর ভরসা থাকেলও মালঞ্চ কিছুটা নাৰ্তাস। তবে সে জানে সোমরাজ স্যারের সঠিক পথপ্রদর্শনের দ্বারা তার প্রস্তুতি বেশ ভালোই।

যথাসময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলো।

ফলপ্রকাশের পর দেখা গেল মালঞ্চ অন্যান্যদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে। সে প্রথম স্থানাধিকারী।

অত্যন্ত আনন্দের মুহূর্তেই সে ভাবছিল স্যারকে ধন্যবাদ কিভাবে জানাবে।

শেষে ঠিক করল একদিন স্যারের বাড়ি গিয়ে দেখা করে আসবে। সে স্যারের বাড়ি চেনে। এর মাঝে কয়েকবার পড়া বুজতে সে তাঁর বাড়িতে গেছে।

(৭)

সোমরাজ নিজের ঘরে বিছানায় বসে কোনো একটা বইয়ের পাতায় মগ্ন হয়ে ছিল। কোনো এক ছাত্রীর দেখা করতে আসার খবর পেয়ে সে বই রেখে বসার ঘরে এসে দেখল মালঞ্চ এসেছে। তার সামনে আসতে এসে নীচু হয়ে প্রণাম করে তার প্রথম হওয়ার খবরের সাথে তার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাল। মালঞ্চ প্রথম হয়েছে এখবর সোমরাজের অজানা ছিল না। তবে সে বাড়ি এসে কৃতজ্ঞতা জানাবে এমনটা সে আশা করেনি। দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করল সে তার যোগ্যতমা শিষ্যাকে।

মালঞ্চ এই প্রথম লক্ষ করল স্যারের দৃষ্টিতে আনন্দ, আন্তরিক আশীর্বাদ আর শ্বেহ
ছাড়াও আরো কিছু একটা আছে, যা ভাষায় বর্ণনা সম্ভব নয়।

সারা পথ মালঞ্চ ভাবতে ভাবতে এলো, স্যারের দৃষ্টির অর্থ কী! সে যা ভাবছে
সত্যিই কি তাই! লজ্জায় তার গালদুটো লালচে হয়ে গেল।

(৮)

একবছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। মালঞ্চ আর সোমরাজ পরস্পরের আরো ঘনিষ্ঠ
হয়ে উঠেছে। তাদের ঘনিষ্ঠতা শিক্ষক-ছাত্রীর গতি পেরিয়ে অন্যদিকে মোড়
নিয়েছে। মালঞ্চ এখন স্নাতকোত্তরের পড়াশোনা করছে।

জীবন যথারীতি প্রবাহিত হচ্ছে। তারা দু'জনে ভবিষ্যতের স্বপ্ন বুনছে। নিয়তি কি
অলক্ষ্যে মুচকি হাসল!

(৯)

টুকাইদাকে কতোদিন পরে দেখল পিছু। প্রায় ঘোল-সতের বছর পরে আবার দেখা।
ছোটবেলায় সে মাঝে মাঝেই মাসিমার বাড়িতে বেড়াতে আসত। তখন তাদের
দু'জনের বয়সই দশ-এগারো বছর। একসাথে খেলাধুলো করেছে তারা দু'জনে।
টুকাইদা খেলতে গিয়ে জ্বালিয়ে মারত। চিমটি কাটা, চুলের বেণী ধরে টান মারা
এসব ছিল তার পিছুকে রাগানোর প্রিয় উপায়। পিছও আঁচড়ে-কামড়ে দিত। মাসিমা
এসে ওষুধ লাগিয়ে দিতেন

আর পিছকে রাগানোর জন্য বকাবকি করতেন তাকে। টুকাইদাকে বকুনি খেতে দেখে হিহি করে হাসতো পিছ। তারপর পিছর বাবা ভিনরাজ্য বদলি হয়ে গেলেন। সেই নির্মল আনন্দও হারিয়ে গেল।

আজ এতদিন পরে টুকাইদাকে দেখে যেন চিনতেই পারছে না পিছ। তার মনে টুকাইদা বলতে একজন দশ বছরের বালকের ছবিই অক্ষিত হয়ে আছে। তার সাথে সামনে দাঁড়ানো এই সুদর্শন যুবকের কোনো মিল নেই। কিন্তু সত্যি বলতে সে প্রথম দেখাতেই মুঝ হয়ে গেছে। চোরা হিল্লোল উঠেছে তার মনের আনাচে কানাচে। টুকাইদার সাথে তার রক্তের সম্পর্ক কিছু নেই। সে তার মাসিমার নন্দের ছেলে। শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন ছেলেটাকে নিজের ছেলের মতোই মানুষ করেছেন তার নিঃসন্তান মাসিমা-মেসোমশাই। মাসিমার নিজের সন্তান থাকলে তাকে তিনি টুকাইদার থেকে বেশি স্নেহ হয়তো করতে পারতেন না।

(১০)

----"মালঞ্চ, শিগাগির টিভি খোল! দেখ কী খবর দেখাচ্ছে!" কীর্তির ফোনটা ধরতেই উত্তেজিতভাবে বলে উঠল সে।

স্নাতক স্তরের পড়াশোনা শেষ হওয়ার পর অন্যান্যদের সঙ্গে যোগাযোগ তলানিতে এসে ঠেকলেও কীর্তি এখনও যোগাযোগ রাখে।

----"কী হয়েছে?" কিছুটা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল মালঞ্চ। সে সবে জলখাবার খেতে বসেছিল।

----"সোমরাজ স্যার, ওঁকে টিভিতে দেখাচ্ছে! নিউজ চ্যানেল খোল! তিনি নাকি
কোন মেয়েকে ধৰ্ণ করেছেন!"

বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মতো ফোনটা পড়ে গেল মালফের হাত থেকে। কয়েকমুহূর্ত পরে
নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে দৌড়ে টিভিটা অন করল মালফ। কীর্তির কথা অক্ষরে
অক্ষরে সত্যি! সত্যিই তাঁকে পুলিশভ্যানে তোলা হচ্ছে! মাথাটা ঘুরে গেল
মালফের।

(১১)

সোমরাজের কেস দাঁড়ালো না। উভয়পক্ষই নিজেকে ভিক্টিম হিসেবে দাবি করছে।
যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ কোনোপক্ষের কাছেই নেই। প্রমাণাভাবে সোমরাজ ছাড়া পেয়ে
গেল।

এসে দাঁড়ালো খোলা আকাশের নীচে।

(১২)

পিছ আজকাল ঘুমোতে যেতে ভয় পাচ্ছে। তাকে শহরের নানান ডাক্তার দেখানোর
পরেও অবস্থার কোনো উন্নতি নেই। প্রায় সমস্ত দিন সে না ঘুমিয়ে কাটায়।
ঘুমের ওষুধেও কিছু লাভ হয়নি। প্রাথমিকভাবে ঘুমিয়ে পড়লেও কিছুক্ষণের মধ্যেই
চিৎকার করে জেগে উঠেছে।

ତାର ମାସିମା-ମେସୋମଶାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାନ୍ଵିତ ହୟେ ପଡ଼େଛେ। ପିହ ତାର ସ୍ବପ୍ନେର କଥା ଜାନିଯେଛେ ତାଁଦେର। ସେଇ ସ୍ବପ୍ନେର କୀ ତାଃପର୍ୟ! ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ ଚାପେର ଫଳାଫଳ! ନାକି କୋନୋ ଗୃହ ରହସ୍ୟ ଆଛେ। ଆସନ ଆରୋ ବଡ଼ୋ କୋନୋ ବିପଦେର ଇଞ୍ଜିତ!

(୧୩)

ଦୁଃସ୍ଵପ୍ନ ପିହର ପିଛୁ ଛାଡ଼ିଛେ ନା। ସୁମେର ଚେଷ୍ଟା କରଲେଇ ସେ ଦେଖିତେ ପାଛେ ଏକଟା ଖୁବ ପରିଚିତ ସର। କିଛୁଟା ଅନ୍ଧକାର। ବାଇରେ ଥେକେ ରାନ୍ତାର ଆଲୋ ଏସେ ପଡ଼ିଛେ। ଠିକ ମାରଖାନେ ଟୁଲେର ଉପର ଦାଙ୍ଗିଯେ ତାର ପରିଚିତ ଏକଜନ ମନୁଷ୍ୟ ଅବସବ। ଗଲାଯ ଏକଟା ଶାଡ଼ିର ଫାଁସ ଜଡ଼ାନୋ। ସୀରେ ସୀରେ ସେ ଶାଡ଼ିଟାର ଅପର ପ୍ରାନ୍ତ ବାଁଧଳ ସିଲିଂ ଫ୍ୟାନେର ସଙ୍ଗେ। ଏକବାର ଗଭୀର ଶ୍ଵାସ ନିଲ। ତାରପର ଏକଧାକ୍ଳାୟ ମରିଯେ ଦିଲ ପାଯେର ନିଚେର ଟୁଲଟାକେ!

ଏହିପର୍ୟନ୍ତିହି! ପ୍ରତ୍ୟେକବାର ଏତଟା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇ ଚିନ୍କାର କରେ ଉଠେଛେ ସେ! ମାନୁଷେର ମୃତ୍ୟୁକେ ଚୋଥେର ସାମନେ ଦେଖାର ଥେକେ ଭୟଂକର ଆର କିଛୁ ହୟ ନା ବୋଧ ହୟ।

ଅନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟଟାଓ ଭୟାନକ! ଏଖାନେଓ ସେଇ ଏକଇ ପରିଚିତ ସର। ଏକଇରକମ ଆଲୋ-ଆଁଧାରିତେ ଛାୟାମୟ ପରିବେଶ। ସେ ଶୁଯେ ଆଛେ ଏକଟା ଖାଟେର ଓପର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାବରଣ! ହାତ-ପା ବାଁଧା ଖାଟେର ସାଥେ। ହାତେ ପାଯେ ଯାତେ ଦକ୍କିର ଦାଗ ନା ହୟ, ସେଇ କାରଣେ ବାଁଧନେର ନିଚେ ମୋଟା କାପଡ଼େର ପାଣ୍ଡି ଜଡ଼ାନୋ।

ସୀରେ ସୀରେ ଏକଟା ପରିଚିତ ଶରୀର ନେମେ ଏଲୋ ତାର ଓପରେ!

ଚିନ୍କାରେର ସାଥେ ସେ ଜେଗେ ଓଠେ ପ୍ରତିବାର!

(১৪)

ইন্দ্রাণীদেবী পিছুর ঘরে তার খাবার দিতে এসে দেখলেন এককোণে জড়সড় হয়ে
বসে আছে পিছু। চোখে উদ্ভ্রান্ত আতঙ্কিত দৃষ্টি। প্লেটটা তার সামনে রেখে তার
মাথায় হাত রাখলেন তিনি। পিছু তার হাতটা সামনের দিকে বাড়ালো। শূন্যে অঙ্গুলি
নির্দেশ করছে সে। সেদিকে তাকিয়ে অবশ্য ইন্দ্রাণীদেবী কিছুই দেখতে পেলেন না।
পিছুর কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে তাকে বাস্তবে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে চেষ্টা করলেন।
জিজ্ঞাসা করলেন সে কী দেখাতে চাইছে। কিন্তু তাঁর প্রশ্নের উত্তরে পিছু শুধুমাত্র
ভয় আতঙ্কমিশ্রিত দৃষ্টি মেলে তাকালো তাঁর দিকে। কোনো প্রশ্নের উত্তর দিল না
সে।

ইন্দ্রাণীদেবী ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেলেন সে কারোর সঙ্গে বিড়
বিড় করে কথা বলছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাইরে চলে এলেন তিনি। পিছুর স্বপ্নের মনুষ্য অবয়ব কে তা সে
বলতে পারছে না। এই সমস্যার উৎস কোথায়! আর কোথায়ই বা এর অন্ত! কেন
বার বার সে একই স্বপ্ন দেখছে! উত্তর অধরা এখনও।

(১৫)

পিছু দিন দিন বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। সে এখন তার আশপাশে কাউকে দেখতে
পাচ্ছে। অথচ তার চারপাশে কেউই নেই। পিছুকে মনোবিদের কাছে নিয়ে যাওয়া
হলেও কোনো সুরাহা হয়নি। বেশিরভাগের বক্তৃব্য অত্যধিক মানসিক চাপের কারণে
সে হ্যালুসিনেট করছে।

ପିହ କାଉକେ ବୋଝାତେ ପାରଛେ ନା, ସେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରହ ନୟ। ହ୍ୟାଲୁସିନେଟ୍ କରଛେ ନା ସେ। ସତିଯିଟି ତାର ଉପସ୍ଥିତି ଆଛେ। କେଉଁ ତାର କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରଛେ ନା।

କିଭାବେ ନିଷ୍କ୍ରିୟା ପାଓଯା ସମ୍ଭବ ତାର ହାତ ଥେକେ! ତାର ହାତ ଥେକେ ପାଲିଯେ କୋଥାଯା ଯାବେ! ଯେଖାନେଇ ଯାକ ସେ ଆସବେ। ତାକେ ପ୍ରତି ରାତ୍ରେ ପୌଁଛେ ଦେବେ ସେଇ ଅଭିଶପ୍ତ ରାତ୍ରିତେ। ଯେଖାନେ ଘଟେ ଗେଛିଲ ଏକ ନାରକୀୟ ଅପରାଧ। ପ୍ରତିଦିନ ଏକଇ ଦୃଶ୍ୟେର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଆର ସହ୍ୟ କରତେ ପାରଛେ ନା ସେ!

(୧୬)

----"ନା, ନା, ନା! କ୍ଷମା କରୋ! ଛେଡ଼େ ଦାଓ ଆମାକେ! ମୁକ୍ତି ଦାଓ! ଏଇ ନରକଯନ୍ତ୍ରଣା ଆର ସହ୍ୟ କରତେ ପାରଛି ନା!"

ପିହର ଚିଢ଼ିକାରେ ତାର ଧରେ ଛୁଟେ ଗେଲେନ ସକଳେ। ସେଥାନେ ଗିଯେ ଦେଖିଲେନ ପିହ ଏଲୋଚୁଲେ, ଆଲୁଥାଲୁ ଅବସ୍ଥାଯ ହାଁଟୁ ଗେଡେ ବସେ ଆଛେ ମାଟିତେ। ହାତଜୋଡ଼ କରେ କ୍ଷମା ଚାହିଁଛେ ଅଦୃଶ୍ୟ କାରୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।

----"କ୍ଷମା କରୋ, କ୍ଷମା କରୋ ଟୁକାଇଦା! ଆମି ଅପରାଧୀ। ଆମି ସେଦିନ ତୋମାର ସାଥେ ଅନ୍ୟାଯ କରେଛିଲାମ। ତୁମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପରାଧ! ଆମି ସବାଇକେ ସତିଯିଟା ଜାନାବୋ। ଆମାକେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଦାଓ! ଦୟା କରୋ! ଦିନେର ପର ଦିନ, ରାତରେ ପର ରାତ ଏକଇ ଦୃଶ୍ୟେର ସମ୍ମୁଖୀନ ହତେ ପାରଛି ନା ଆର!"

ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀଦେବୀ ଆର ପିନାକିବାବୁ ଯେନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ପୃଷ୍ଠ ହଲେନ!

কিছুক্ষণ পরে পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়ালো এবাড়ির দরজায়।

(১৭)

পিছর টুকাইদা অর্থাৎ মালঞ্চের সোমরাজ শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন। তাকে বড়ো করে তোলেন তার মামা-মামী। সেই মামীমার বোনকি পিছ পড়াশোনার সূত্রে এসে ওঠে তাদের বাড়িতে। অনেকদিন পর তাকে দেখে সোমরাজও খুশি হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন পর থেকেই সে বুঝতে পারল পিছর ভাবগতিক সুবিধের নয়। সে মনে মনে তাকে পেতে চায়।

তখন থেকেই তাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে সোমরাজ। কিন্তু কোনোভাবেই পিছকে নিরস্ত করা সম্ভব হচ্ছিল না। সে নানান অঙ্গিলায় তার সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করত।

শেষ পর্যন্ত এলো সেই দিনটা। ছুটির দিনে মামা-মামীমার দ্বিপ্রাহরিক ঘুমের সুযোগে সে এসে দাঁড়িয়েছিল সোমরাজের ঘরের দরজায়। তাকে প্রণয়নিবেদন জানতে।

সে দ্বিতীয়বার তার দরজায় এসেছিল প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ নিতে!

মামা-মামীমা সেদিন গেছিলেন তাঁদের কোনো এক বন্ধুর চল্লিশতম বিবাহবার্ষিকীর উদযাপনে। ফেরার সময় আচমকা কালৈশাখীর ঘন মেঘ ঘিরে আসে আকাশ জুড়ে। সেই মেঘ হয়তো সোমরাজের জীবনে অঁধার ঘনিয়ে তোলার জন্যই প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিল। মামা-মামীমা আটকে পড়েছিলেন সেই দুর্ঘোগে। ফোন করে জানিয়েছিলেন রাতে ফিরতে পারবেন না।

নিজের ঘরে বিছানায় বসে বইয়ের মধ্যে মগ্ন হয়ে ছিল সোমরাজ। এতটাই
বাহ্যজ্ঞানরহিত হয়ে ছিল যে কখন পিছ তার ঘরে এসে চুকেছে সে টেরও পায়নি।
দরজার দিকে পিঠ করে বসে ছিল সো এমন সময় পা টিপে টিপে ঘরে চুকল পিছ।
তার মনের মধ্যে তখন তীব্র প্রত্যাখ্যানের জ্বালা আর দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা
প্রতিশোধের আগুন!

কিছুক্ষণ পরেই সোমরাজ অনুভব করল ঘাড়ের কাছে মোলায়েম হাতের ঘা,
তারপর অঙ্কার!

চোখে মুখে জলের ছিটের সাথে জ্ঞান ফিরল সোমরাজের। ডান হাতটা মুখের কাছে
নিয়ে আসার চেষ্টা করতেই বুঝতে পারল হাতটা খাটের সাথে বাঁধা। তারপর সে
অনুভব করল তার বামহাত এবং দুই পাও খাটের সাথে বাঁধা, বাঁধনের নীচে মোটা
কাপড়ের পটি জড়ানো যাতে দড়ির দাগ না হয়। এবং সে সম্পূর্ণ নিরাবরণ! তার
সামনেই পিছ দাঁড়িয়ে খিল খিল করে হাসছে!

(১৮)

পরের দিন সকালে পিছ তার বাঁধন খুলে দিল। সে জামাকাপড় নিয়ে সোজা
বাথরুমে গিয়ে হড় হড় করে বমি করে দিল। তারপর শাওয়ার চালিয়ে বসে পড়ল
তার নীচে। প্রবহমান জলধারার সাথে মিশে গেল তার চোখের মুক্তোবিন্দু।

অনেকটা সময় বাথরুমে কাটিয়ে সে বের হল সেখান থেকে। বেরিয়ে দেখল তার
মামা-মামীমা অর্থাৎ ইন্দ্রাণীদেবী এবং পিনাকীবাবু ততক্ষণে এসে পৌঁছে গেছেন।
তাঁদের

সାମନେ କ୍ରନ୍ଦନରତ ପିହା ତତକ୍ଷଣେ ତାର କଥାନୁଯାୟୀ ତାଁରା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନିଯେଛେ
ତାଁଦେର ଅନୁପାନ୍ତିତିର ସୁଯୋଗେ ସୋମରାଜ ପିହକେ ଧର୍ଵଣ କରେଛେ!

ପିନାକିବାବୁ ଦୁ'ଚୋଖେ ସ୍ଫୁରଣ୍ଣ ନିଯେ ଏଗିଯେ ଏଲେନ ତାର ସାମନେ। ଠାସ କରେ ସପାଟେ ଏକଟା
ଚଢ଼ ପଡ଼ିଲ ତାର ଗାଲେ। ଚୋଖ ଫେଟେ ଜଳ ଆସତେ ଚାଇଲ ତାର। ମାମା ଆର ମାମୀମା
ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ କରଲେନ!

ପିନାକିବାବୁ ପୁଲିଶେ ଖବର ଦିଲେନ।

(୧୯)

ସୋମରାଜ ଉପ୍‌ୟୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣେ ଅଭାବେ ମୁକ୍ତ ହେଁ ଗେଲା। ସଖନ ବାଡ଼ି ଫିରିଲ ତଥନ ଦୁପୂର।
ରାତ ପ୍ରାୟ ବାରୋଟା ବାଜେ। ସୋମରାଜ ତାର ଘରେର ବିଛାନାୟ ଶୁଯେ ଆଛେ। ସୁମୋଯନି। ଶୂନ୍ୟ
ଦୃଷ୍ଟି ମେଲେ ତାକିଯେ ଆଛେ ସିଲିଂଯେର ଦିକେ। ମାମା ତାକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାନିଯେଛେ ଶୁଧୁ
ଆଜକେର ରାତ୍ରିକୁ ଏବାଡ଼ିତେ ଆଶ୍ରୟ ଆଛେ ତାର।

ଆଜ ପ୍ରାୟ ସାରାଦିନ ସେ ଅଭୁତା କିନ୍ତୁ ଦେହେର କଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତ ହଚ୍ଛେ ନା ଆର। ମନେରେ
ନା। ଚାରିଦିକ ଥେକେ ଧେଯେ ଆସା ଅପମାନ, ଲାଞ୍ଛନା ସେ ସହ୍ୟ କରେଛେ ଦାଁତେ ଦାଁତେ ଚେପେ।
କିନ୍ତୁ ସବଚୟେ କାହେର ତିନଜନ ମାନୁଷ, ମାମା-ମାମୀମା ଆର ମାଲଙ୍ଗ; ଏହି ତିନଜନେର
ଅବିଶ୍ୱାସ କାଁଚେର ଟୁକରୋର ମତୋ ବିଁଧେଛେ।

ଆଜ ବିକେଳେ ସେ ମାଲଙ୍ଗେର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରେଛେ। ସେଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାନିଯେଛେ ଏକଜନ
ଅପରାଧୀର ସାଥେ ସେ କୋନୋରକମ ସମ୍ପର୍କ ରାଖିବେ ନା।

মালঞ্চ চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ সেখানেই বসে ছিল সে। তারপর ধীরপায়ে
ফিরে এসেছিল। পাড়ার সকলে তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে অনেকরকম মন্তব্য করছিল।
এখন তার হৃদয় অনুভূতিহীন। ক্রমাগত রক্তক্ষরণে অবসন্ন। সহ্যাতীত যন্ত্রণায় সমস্ত
অনুভূতি লুপ্ত হয়ে গেছে।

সোমরাজ ধীরে ধীরে উঠে বসল। বিছানা থেকে উঠে আলমারি থেকে বের করে
আনল একটা নতুন লাল শাড়ি। এই দুর্ঘাগের ঠিক আগে সে কিনেছিল এটা।
মালঞ্চের জন্মদিনের উপহার। লাল রং তার প্রিয়। এটা আর কোনোদিন তাকে
দেওয়া হয়ে উঠবে না।

ধীরে ধীরে টুলটার ওপরে উঠে দাঁড়ালো সে। শাড়িটার একটা প্রান্ত ফাঁসের মতো
জড়ানো তার গলায়। আরেকটা প্রান্ত বাঁধল সিলিং ফ্যানের সাথে।
একটা গভীর শ্বাস। ধাক্কা মেরে ফেলে দিল পায়ের নীচের টুলটা।

(২০)

ওরা তিনজন বসে আছেন টুকাই ওরফে সোমরাজের ছবির সামনে। ইন্দ্রাণীদেবী,
পিনাকীবাবু আর মালঞ্চ। পিছুর স্বীকারোক্তির খবর মালঞ্চের কাছে এসে পৌঁছেছে।
সেদিন রাতে সোমরাজ পিছুর সাথে অপরাধ করেনি। ঘটনা ঠিক উল্লেটা। পিছু
অপরাধ করেছিল সোমরাজের সাথে।

পিছ এখন অ্যাসাইলামে। সোমরাজের অতৃপ্তি আস্বা, তার ওপর হওয়া নির্যাতনের
প্রতিশোধ নিয়েছে এভাবেই।

মালঞ্চ আর সোমরাজের মামা - মামীমা আজ বুরতে পেরেছেন তাঁরা কতো বড়ো
ভুল করেছেন। কিন্তু এখন অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। সোমরাজ এখন তাঁদের
থেকে বহুদূরে, এক অন্য জগতের বাসিন্দা। তাকে আর ফিরিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব
নয় কোনোভাবেই।

তিনজনেই তাকিয়ে আছেন হাস্যমুখ সোমরাজের ছবির দিকে। তাদের ঠিক পিছনে
এসে দাঁড়ালো এক ছায়ামূর্তি। শেষবারের মতো দেখল তাঁদেরকে। অল্প হাসির রেখা
চারিয়ে গেল তার মুখে। ধীরে ধীরে সে যাগ্রা করল অনন্তের উদ্দেশ্যে।

॥ সমাপ্ত ॥



কথা রেখেছি

অঙ্কন দণ্ড

“আমি তোকে অনেক ভালোবাসি রে। এভাবে একা করে যাস না আমায়।” করুণ
সুরে বলতে থাকে দ্বীপ।

” আরে ছেড়ে তো যাইনি। শুধু একটু ব্রেক নিচ্ছি। তাও আমাদের ভালোর জন্য,
আমাদের ক্যারিয়ারের জন্য দ্বীপ। একটু স্যাক্রিফাইস করতে পারবি না আমাদের
ভালোবাসার জন্য?”, নিষ্ঠুরের মতো বলে গেল শ্রী।

- কিন্তু...
- কোন কিন্তু নয় দ্বীপ। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর আমরা তো বিয়ে করব।
তুই আমার সাথে কোন যোগাযোগ না রেখে ভালোবেসে যেতে পারবি না আমায়?
- পারবো শ্রী। কিন্তু এভাবে হয় না। যোগাযোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন, এ কী করে সন্তুষ্ট?
- চাইলে সব সন্তুষ্ট দ্বীপ। আমি তোকে পারমানেন্টলি চাই। তাই এটাই আমার
ডিসিশন যার কোন নড়চড় হবে না।
- আচ্ছা শ্রী, তোর যা ইচ্ছা। ভালো থাকিস।
- তুইও ভালো থাকিস দ্বীপ। সারা জীবন পাশে থাকবি তো আমার?
- হ্ম শ্রী। আমি সারাজীবন তোর পাশে থাকবো।

একে অপরকে গভীর আলিঙ্গনে বেঁধে বিদায় নিল শ্রী ও দ্বীপ। উভয়ের অন্তরে
বর্তমান কেঁদে মরছিল আর ভবিষ্যৎ জ্বালাছিল আশার কিরণ।

দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল একটা মাস। উভয়ের যোগাযোগ সম্পূর্ণ রূপে ছিন্ন।
প্রেমাকীর্ণ দুটি মন বরাবর চেয়েছে একে অপরের খোঁজ নিতে। কিন্তু একজন হেরে

গেছে নিজের অটল সিদ্ধান্তের কাছে এবং অপরজন চায়নি প্রেমিকাকেও অসন্তুষ্ট করতে।

মাস ২ পরে

শ্রী খুব ব্যস্ত। আগামীকাল কলেজে অ্যাসাইনমেন্ট জমা করার শেষ দিন। আজ তাকে সারা রাত জেগে অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করতেই হবে। সেই বিকেল পাঁচটার সময় লিখতে বসেছে সে, রাত নাটা অবধি লিখেই চলেছে। এত লিখে খানিকটা ক্লান্তি অনুভব করলো শ্রী। ভাবলো আধঘন্টা একটা ন্যাপা দিয়ে আবার লেখা শুরু করবে। সে অনুযায়ী অ্যালার্ম দিল, কিন্তু একেই সে ক্লান্তি, উপরন্তু তার ঘুমকাতুরে স্বভাব। অ্যালার্মের চিৎকার তার ঘুমের কাছে হার মানল। শ্রীর মা-ও তাকে ডাকেনি সারা সন্ধ্যে কাজ করেছে বলে। শ্রী-র যখন ঘুম ভাঙলো তখন চোখ ডলতে ডলতে ঘড়ির দিকে তাকায় সো দেখে ঘড়িতে ভোর সাতটা কুড়ি। বুকটা ছ্যাঁত করে ওঠে তার। অ্যাসাইনমেন্ট এখনও অর্ধেক এর উপর বাকি। দশটা থেকে কলেজ। এই কম সময়ে সে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। সে দেখে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো গুছিয়ে টেবিলের ওপর রাখা আছে। কিন্তু এ কী! অ্যাসাইনমেন্ট তো পুরো কমপ্লিট। শ্রী-র চক্ষু চড়কগাছ। এ কী করে সন্তুষ? সে তো ঘুমিয়ে পড়েছিল। তবে কে শেষ করল এটা? শ্রী মনে করার চেষ্টা করল ঘুমের মাঝে উঠে অ্যাসাইনমেন্ট কমপ্লিট করেছে কিনা? কিন্তু না, সবকিছু ঝাপসা লাগল তার। ওদিকে কলেজের জন্য দেরী হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেওয়া যাবে এটা একটা শান্তি তার মনে। কলেজের জন্য তৈরী হয়ে, খাবার খেয়ে বেড়িয়ে পড়লো শ্রী কলেজের উদ্দেশ্যে। তার মনের মধ্যে একটাই চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগলো কে কমপ্লিট করলো তার

অ্যাসাইনমেন্ট ? এই চিন্তায় বিভোর শ্রী আনমনা হয়ে হাঁটতে থাকে রাস্তা দিয়ে। হঠাৎ একটা মারুতি ভ্যান তীব্র বেগে ছুটে আসে তার দিকে। ভ্যানের হর্ণ যেন তার কানে প্রবেশ করছে না। ভ্যানের ড্রাইভার ব্রেকফেল হওয়া গাড়ি থামাতে ব্যর্থ। ভ্যানটা শ্রী-কে যেই ধাক্কা মারতে যাবে শ্রী ছিটকে পড়লো ফুটপাতের ধারে। না, শ্রী-র বিন্দুমাত্র চোট লাগেনি। ভ্যানটাও কিছুটা গিয়ে থেমে গেল। শ্রী অনুভব করলো কেউ যেন তাকে ঠেলে ফুটপাতের ধারে ফেলে দিল। লোক হই হই রই রই করে উঠলো। সবাই বেশ করে ধরকে দিল শ্রী-কে রাস্তা না দেখে চলার জন্য। ভ্যানচালকের যা হওয়ার তা হল। সেখানকার একটি মেয়ে সাবধানে স্কুটিতে করে শ্রী-কে পৌঁছে দিয়ে এলো কলেজে। কলেজ ছুটির পর বাড়ি ফিরছে শ্রী। অ্যাসাইনমেন্ট জমা হয়ে গেলেও প্রশ্নটা তার পিছু ছাড়ছে না। হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি নামলো। ডিলেটাপাল্টা চিন্তায় ছাতা নেওয়ার কথা ভুলেই গেছে সোকিস্ট এটা কী হচ্ছে তার সাথে? চারিদিকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে অথচ সে নিজে দিচ্ছে না কেন? শ্রী বৃষ্টিতে ভেজার চেষ্টা করেও ভিজতে পারছে না কেন? কেন জল তাকে স্পর্শ করছে না? হঠাৎ একটা টোটো এসে থামল তার সামনে, "দিদি যাবেন?" ভীতসন্ত্রিষ্ঠ শ্রী চেপে বসল টোটোতে। একটার পর একটা ঘটনা তার মনে চিন্তা ও ভয়ের স্ট্যাম্প মারছে। অ্যাসাইনমেন্ট কমপ্লিট, ধাক্কা খেয়ে ফুটপাতে পড়ে যাওয়া, বৃষ্টির জল গায়ে না লাগা। নাহ, কিছু তুকছে তার মাথায়। বাড়ি ফিরে ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করলো না শ্রী। সমস্ত ঘটনা গুলি মা-কে খুলে বলায় গুরুত্ব না দিয়ে মনের ভুল বলে সান্ত্বনা দিল শুধু। কিস্তি শ্রী জানে এ তার মনের ভুল নয়। সে ভাবল যে এসব দ্বীপকে একবার জানানো দরকার। না, অনেক হয়েছে। কাল একবার ফোন করতেই হবে দ্বীপকে।

সারাদিন চিন্তা করে করে কন্তু শ্রী এলিয়ে দিল তার শরীরটাকে বিছানায়। সঙ্গে সঙ্গে পোঁচে গেল গভীর নিদ্রায়। হঠাৎ একটা হাত আলতো করে শ্রী-র মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে বলল," শ্রী মা ওঠ, দ্যাখ আমি এসেছি। ওঠা!" চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসে শ্রী দেখে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ওর বাবা। সাথে সাথেই বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল শ্রী-র। এয়ার কণ্ঠিশনড রুমেও দরদর করে ঘামছে সে।

অস্ফুট স্বরে বললো , " বাবা! এ কী করে সন্তুষ্ট? তুমি তো..."

- হ্যাঁ মা,তুই যখন ক্লাস এইটে পড়তিস তখনই আমি ইহলোকের মায়া ত্যাগ করেছি। ভয় পাস না মা। কতদিন দেখিনি তোকে। দ্বীপ না থাকলে হয়তো আর তোকে দেখাই হতো না।

"দ্বীপ? কোথায় ও? তুমি কী করে জানলে ওকে? কি করেছে ও?" বলে পিছনে সরে গেল শ্রী।

- আরে দ্বীপই তো আমায় তোর কাছে নিয়ে এলো। ছেলেটা ভীষণ ভালো রে। আর তোকে ভীষণ ভালোবাসে।

- মানে? দ্বীপ কোথায় বলো?

- ও এখন আমাদের দেশে।

এতক্ষণ শ্রী তেমন ভয় না পেলেও এবার তার হৃদপিণ্ডের শব্দ তার কান ছুঁতে লাগলো। সে বলল, "বলতে কী চাইছো? আর তুমি কীভাবে..."

"এখন আসি মা। পরে কথা হবো" এই বলে অদৃশ্য হয়ে গেল শ্রী-র বাবা।

ହଠାତ୍ ଦେଓଯାଲେ ରକ୍ତେର ଅକ୍ଷରେ ଫୁଟେ ଉଠିଲୋ କଯେକଟା ଲେଖା । "କଥା ଦିଯେଛିଲାମ
ସାରାଜୀବନ ତୋର ପାଶେ ଥାକବୋ ଏହିଭାବେଇ ପାଶେ ଥାକବୋ ଅଶ୍ରୀରୀ ହୟେ ।

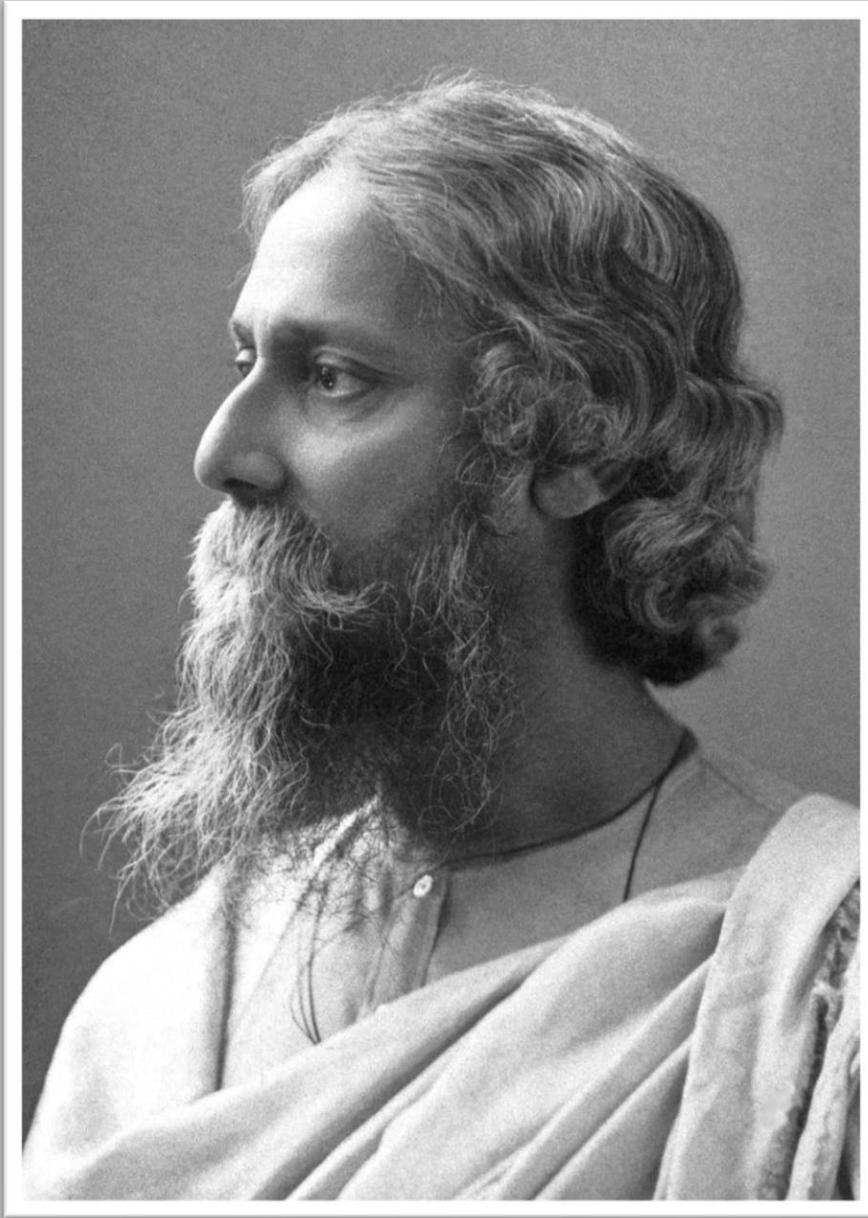
- ଇତି ତୋର ଦ୍ଵୀପା ।"

ଶ୍ରୀ ଅନୁଭବ କରିଲୋ ତାର କପାଳେ ଏକଟି ଆଲତୋ ସ୍ପର୍ଶ, ଠିକ ଯେମନଟା ଦ୍ଵୀପ ତାର
କପାଳେ ଚୁମୁ ଖାଓଯାର ସମୟ ହତୋ ଠିକ ସେଇରକମ ।

ଶ୍ରୀ-ର ପ୍ରବଳ ଚିନ୍କାର ଓ କାନ୍ନାୟ କେଂପେ ଉଠିଲୋ ସାରା ଘର ।

(ସମାପ୍ତ)

ঠাকুর ও প্রেতচক্র



জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত ‘ভারতী’ পত্রিকার আশ্বিন, ১৩০১
সংখ্যায়, প্ল্যানচেট করার জন্য এক আশ্চর্যজনক ভৌতিক যন্ত্রের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত
হয়েছিল— ‘নির্মাতা শরৎচন্দ্ৰ ভট্টাচার্য, ১০৮, আপার চিংপুর রোড,

গরানহাটা, কলিকাতা, মূল্য আড়াই টাকা, প্যাকিং ও ডাকমাশুল বারো আনা'। উত্তর কলকাতার কোনো বনেদি পরিবারে অনুসন্ধান করলে শতবর্ষ আগের সেই ঐতিহাসিক যন্ত্রের দু-একটা ভগ্নাংশও মিলবে কি না জানা নেই। কিন্তু বিজ্ঞাপন থেকে মনে হয়, যন্ত্রটির চাহিদা ছিল। অন্তত চিৎপুরের ঠাকুরবাড়িতে যে দু-এক পিস চুকে পড়েছিল, তা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। কারণ, রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রটির বাংলা নামকরণ করেছিলেন—‘প্রেতবাণীবহু চক্রযান’।



রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, এইভাবেই যন্ত্রের সাহায্যে প্ল্যানচেট করে কবির সঙ্গে মাইকেল মধুসূদনের প্রথম আলাপ হয়েছিল। মধুসূদনের মৃত্যুর সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স ১২ বছর, সুতরাং সেই আলাপচারিতা তাঁর কৈশোরের অভিজ্ঞতা বলে ধরে নেয়া যেতে পারে কারণ সেই সময়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে নিয়মিত প্রেতচক্র বসতো এবং কিশোর কবিরও সেই চক্রে বসার স্বাধীনতা ছিল। বিশ-একুশ বছর বয়সেও তিনি প্ল্যানচেট করতেন, তার লিখিত প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু সেই

ଚକ୍ରେ ଆଯୁତ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହତେ ପାରେନି। କାରଣ, ଅନ୍ୟତମ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେମେନ୍ଦ୍ରନାଥେର ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ।

ଅନେକ ବହୁ ପରେ, ତଥନ ତାଁର ବୟସ ୬୮ ବହୁ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଆବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନଃସଂଯୋଗ କରେ ପରିଣତ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଆଲୋକ ପରଲୋକଚର୍ଚାୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଯେଛିଲେନା । ୧୯୨୯ ମେସର ଅକ୍ଟୋବରେର ଶେଷେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥେର ମଙ୍ଗେ ପରିଚିଯ ହୁଏ ପ୍ରେତଚର୍ଚାୟ ଅଲୋକସାମାନ୍ୟ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରିଣୀ ଏକ ତରଣୀରା ସେ ବହୁ ପୂଜା ଦେଇତେ ପଡ଼େଛିଲ, ଶରତେର ଶେଷ, ଆଶ୍ରମ ଜନଶୂନ୍ୟ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଏକାଇ ଛିଲେନ ଉତ୍ତରାୟଣ ଭବନେ । ତାଁର ଅତିଥି ହେଯେ ଶାନ୍ତିନିକେତନେ ପୌଁଛିଲେନ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥେର ପୁରୋନୋ ବନ୍ଧୁ ଓ ତାଁର ବହୁ କାବ୍ୟଗ୍ରହେର ପ୍ରକାଶକ ମୋହିତଚନ୍ଦ୍ର ସେନେର



ଶ୍ରୀ ପ୍ରବୀର ଘୋଷ ରଚିତ ଅଲୋକିକ ନୟ ଲୌକିକର ପାତା ଥେକେ

মেয়ে উমা দেবী। কয়েক দিনের মধ্যেই কবির কানে খবর গেল, উমা একাধারে কবি এবং ভাল মিডিয়াম। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ থেকে পেয়েছিলেন একটি তথ্য— এক ধরনের অতি-সংবেদনশীল মানুষ থাকেন, যাঁরা মৃত আত্মাদের আকর্ষণ করতে পারেন এবং তাদের সঙ্গে মরজগতের একটা যোগসূত্র স্থাপন করতে পারেন। আধুনিক প্রেততত্ত্বের ভাষায় এঁদের বলা হয় ‘মিডিয়াম’। উমাদেবীর ভালো মিডিয়াম হওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে জানতে পেরে কবি খুবই আগ্রহী হয়ে নিয়মিত চক্রের আয়োজন করেন। তিনি প্রেতলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য সরাসরি মিডিয়ামের সাহায্য নিয়ে শুরু করলেন প্ল্যানচেট।

প্রেতচক্রের যাবতীয় নিয়ম ভঙ্গ করে রবীন্দ্রনাথ উমার মুখোমুখি বসে তাঁকে প্রশ্ন করতেন। মিডিয়ামের হাতে কাগজ পেন্সিল থাকতো, তিনি উত্তর শুনে দ্রুত কথাগুলি লিখে কবিকে দেখাতেন। তাঁকে লিখতে সাহায্য করেছিলেন অমিয় চক্রবর্তী আর মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। ঘরে আরও অনেকে উপস্থিত থাকতেন, কিন্তু প্রশ্ন শুধু কবিই করতেন। এইভাবে আটটি ফুলঙ্কেপ কাগজের মোটামোটা খাতা ক'দিনে ভরে উঠেছিল। অক্টোবরের প্রারম্ভিক অধিবেশনগুলির কোন বিবরণ নেই, কিন্তু নভেম্বরে পর পর বেশ ক'দিন এবং ডিসেম্বরেও যে ক'দিন উমাদেবী শান্তিনিকেতনে ছিলেন, তাঁকে কেন্দ্র করে পুরোদস্ত্র প্রেতচক্র বসেছিল, যার বিবরণী শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে পরম যত্নে সংগ্রহীত রয়েছে। কবির ডাকে সাড়া দিয়ে এসেছিলেন তাঁর প্রায় সমস্ত প্রয়াত আত্মীয় ও বান্ধবকুল।

আত্মপরিচয় না দিয়েও একজন বার বার এসে পড়েছেন, তিনি নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী। এই মহামিলনচক্রের কথোপোকথন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনে কোন সন্দেহ

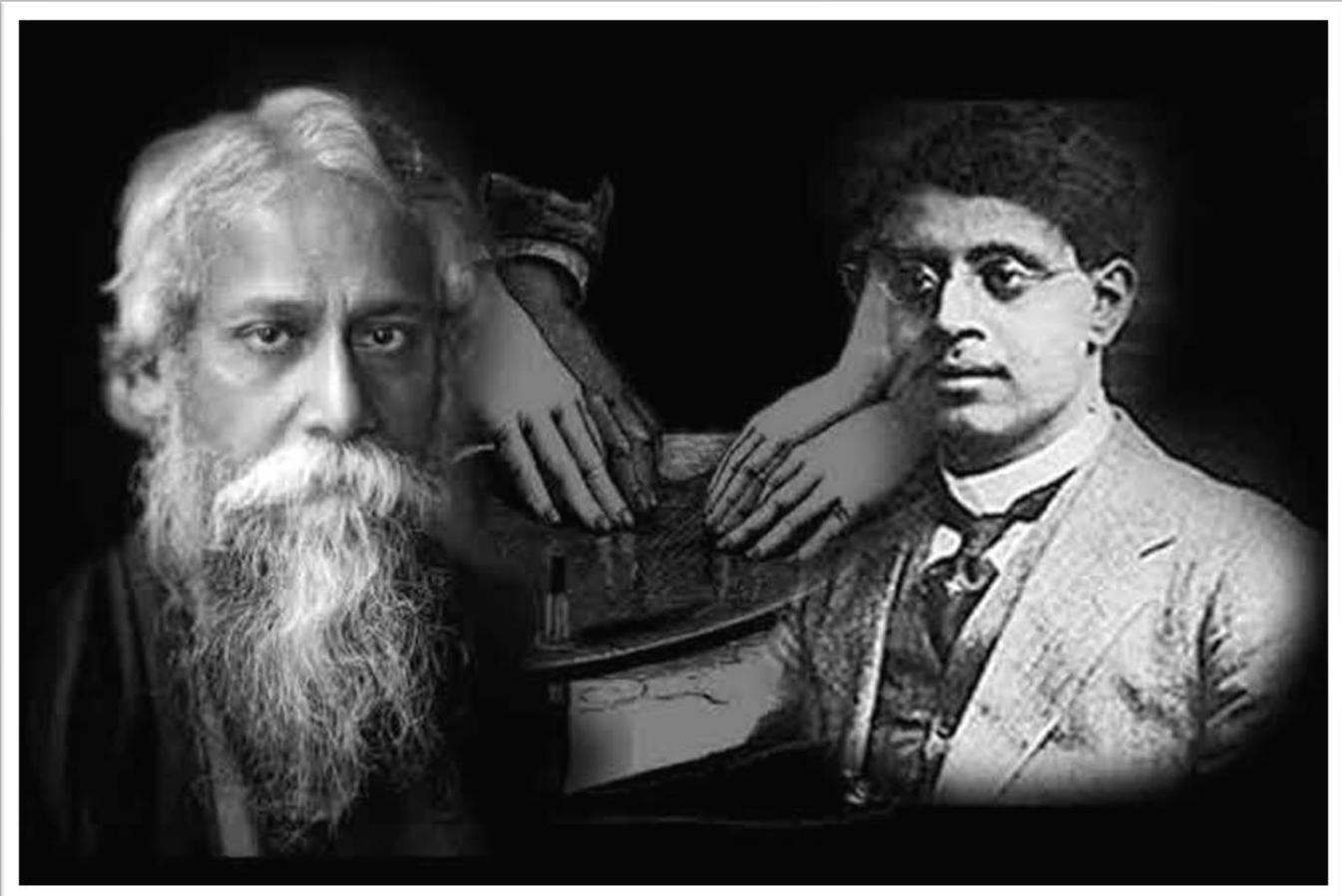
ছিল না যে, তাঁর প্রিয় মানুষরাই তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে এসেছিলেন, যদিও তাঁর জীবিত নিকটজনরা অনেকেই মৃত আত্মাদের চক্রে আসা সম্পর্কে ততটা নিঃসন্দিধ্ব হতে পারেননি। এঁদেরই একজনকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— ‘পৃথিবীতে কত কিছু তুমি জানো না, তাই বলে সে সব নেই? কতটুকু জানো? জানাটা এতটুকু, না জানাটাই অসীম। সেই এতটুকুর ওপর নির্ভর করে চোখ বন্ধ করে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া চলে না... যে বিষয় প্রমাণও করা যায় না, অপ্রমাণও করা যায় না, সে সম্বন্ধে মন খোলা রাখাই উচিত। যে কোনো একদিকে ঝুঁকে পড়াটাই গৌঁড়ামি।’

নতুন বৌঠান কাদম্বরী, স্ত্রী মৃগালিনী, পুত্র শমী, কন্যা মাধুরীলতা, নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতোই প্রেত-অধিবেশনে একদিন এলেন বিদেহী সুকুমার রায়। তাঁর গানের সমবাদার সুকুমারের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ ধরলেন ‘তরী আমার হঠাতে ডুবে যায়...’। মাঝপথে থেমে গেলেন গানটার কথা ভুলে! সুকুমারের আত্মা রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করে বসল, “আমার ছেলেকে আপনার আশ্রমে নিতে পারেন?”

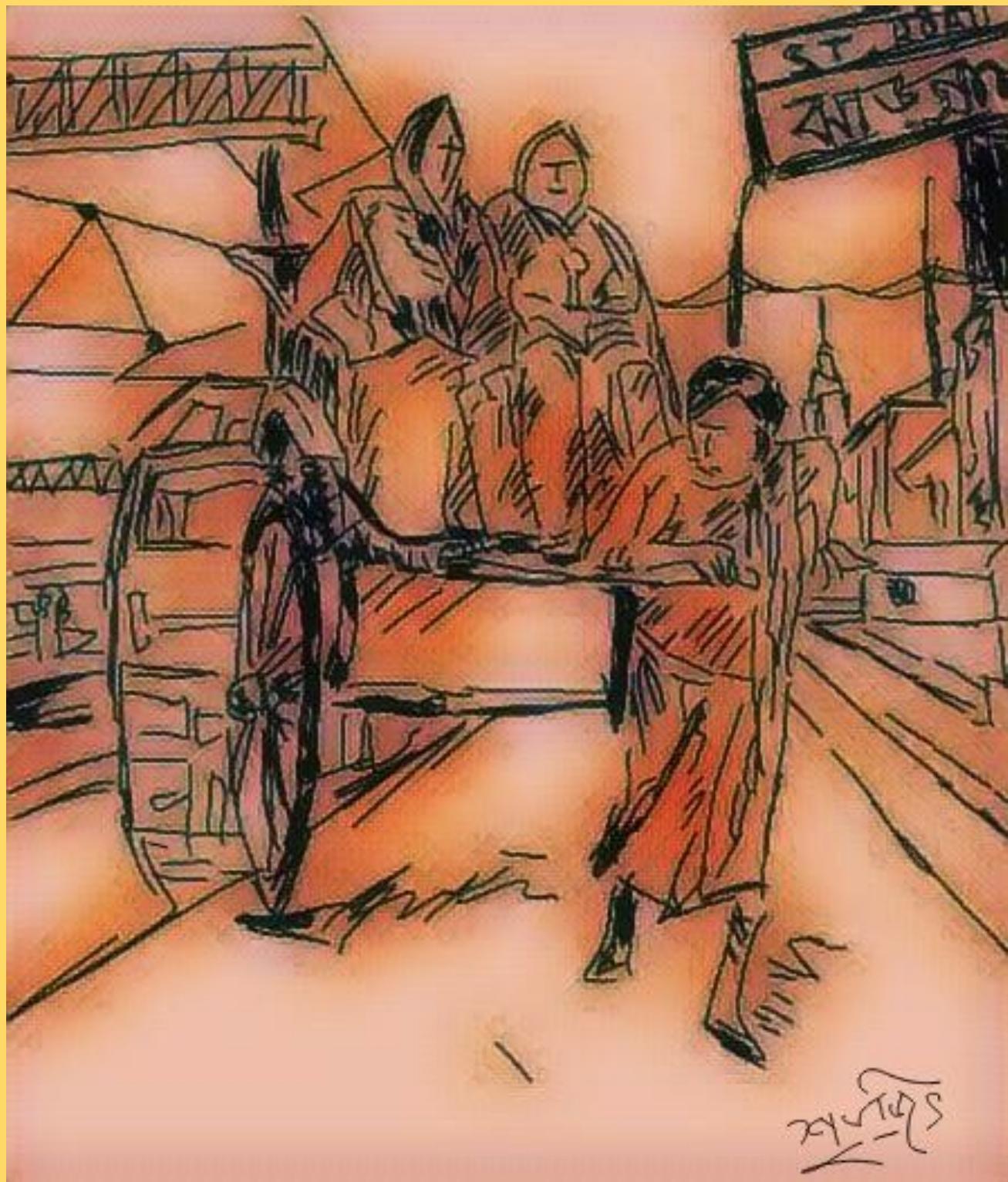
সুকুমারের এই ইচ্ছের কথা তাঁর স্ত্রী সুপ্রভাকে জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। এই কথা শুনে কিছু দিন ছেলেকে নিয়ে কবির শান্তিনিকেতনে কাটিয়েও যান সুপ্রভা। কিন্তু সদ্য বাবা-হারানো ছেলেকে কী ভাবে আর একা ছেড়ে আসেন সেখানে! কিন্তু এর ঠিক দশটা বছর পর দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের আশ্রমে সত্যজিৎকে পড়তে পাঠিয়ে দিচ্ছেন সুপ্রভা রায়।

ভূতদের ঘড়যন্ত্র থেকে বিশ্বকবিও রেহাই পাননি। রবীন্দ্রনাথের প্রেতচক্রের মিডিয়াম উমাদেবী, যাঁর হাত ধরে চুম্বকের মতো নেমে আসতেন পরলোকের বাসিন্দারা, ঠিক

এক বছর পরে, ২২ ফেব্রুয়ারি, মাত্র ২৭ বছর বয়সে, নিজেই পরলোকে চলে গিয়েছিলেন মাত্র ক'দিনের রোগভোগে। রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা উমাদেবীর মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, পড়ে ছিল শুধু প্রেতচক্রের খাতাঙ্গলো। যেখান থেকে সামান্য কিছু কথোপকথন রবীন্দ্র-গবেষক অমিতাভ চৌধুরী সর্বজনসক্ষে তুলে ধরেন ১৯৭৩ সালে। বইটি আজও সুপারহিট।



(সমাপ্ত)



শচীন বাবুর বাসা

দেবাশীষ দড়ি

ଶ

ଚିନ ବାବୁର ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ନେହଲତାକେ ନିଯେ ଶେଷ ବିକେଲେର ଟ୍ରେନେ ଝାଡ଼ଗ୍ରାମ ସେଟଶନେ ନାମଲେନା

ନେମେଇ ତାଁର ମନେ ହଲ, ଟ୍ରେନେର ଛ୍ୟାମରାଟା ଭୁଲ ସେଟଶନେ ତାଁଦେର ନାମିଯେ ଦିଯେଛେ। ମନେ ମନେ ଏକପ୍ରତ୍ଯେ ଗାଲାଗାଲି କରଲେନା। ଏକଟା ହକାର ଚାଯେର ଖାଲି କଟେଇନାର ଦୁଲିଯେ ଯାଚିଲା। ତାକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ - ହେଇଡା କୋନ ସେଟଶନ ରେ ?

: ଝାଡ଼ଗ୍ରାମ

ଶଚିନବାବୁ ହାଁ। ପେଣ୍ଠାଇ ଅଫିସ ବିଲ୍ଡିଂ, ଚକଚକେ ଶେଡ, ତାର ନିଚେ ଝକଝକେ ବେଞ୍ଚି ପାତା--- ଏଟା ଝାଡ଼ଗ୍ରାମ ? ଆଗେ ଟ୍ରେନ ଥେକେ ନାମାର ସମୟ ତିନ ଚାରଟେ ସିଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗଲେ ତବେ ପ୍ଲ୍ୟାଟଫର୍ମେ ପା ପୌଛାତା। ଆଜ ତୋ ଏକ ସିଙ୍ଗିତେଇ କେଳାଫତୋ ସେଇ ଛିଯାଶି ସାଲେ ଝାଡ଼ଗ୍ରାମ ଛେଡେଛି। ଏଥନ୍ତେ ସେଇ ଗେଁଯୋ ସେଟଶନେର ଛବିଟାଇ ଆଁକା ହୟେ ଆଛେ ।

ସ୍ନେହଲତା ବଲଲେନ - ଆମରା ଯତ ବୁଝିଦା ହଇତାମି ଝାଡ଼ଗ୍ରାମଟି ତତ ସାଇଜ୍ୟା ଗ୍ରିଜ୍ୟା କଚିଖୋକାଟି ହଇତାମେ ।

ଶଚିନବାବୁ ବେଳା ଥାକତେ ଥାକତେ ବାସାଯ ଯେତେ ଚାନା ଦେଖତେ ଦେଖତେ ତାଁରେ ଏକଶୋ ତେବ୍ରିଶ ବଚର ବୟସ ହୟେ ଗେଲୋ । ସ୍ନେହଲତାର କିଛୁଟା କମ । ଏଥନ କି ଆର ହାଁଟାହାଟି କରାର ବୟସ ? ରିକଶା ଧରେଇ ଚଲେ ଯାବେନା ଓଇ ତୋ କାଠଚାରାର ପାଶ ଦିଯୋ କିନ୍ତୁ କୋନଦିକେ ନାମବେନ ଠାହର କରତେଇ ଅନେକଟା ସମୟ ଚଲେ ଗେଲୋ । ସବଦିକଇ ଅଚେନା । ଏହି ଓଭାରବ୍ରିଜଟା କୋଥା ଥେକେ ଏସେ ଜୁଟିଲ କେ ଜାନେ ? ରିକଶା ସଟ୍ୟାନ୍ଡେ ଏସେ ଏକଟାଇ ରିକଶା ପେଲାମ । ସବାଇ ଛୁଟଛେ 'ଆୟାଇ ଟୋଟା ଆୟାଇ ଟୋଟା' କରେ ।

ଟୋଟୋ ଆବାର କି ?

ରିକଶାଓଯାଲା ଯିମୁଚିଲ । ତାକେ ବଲଲାମ - କଦମକାନନ ଯାଇବା ?

ଯାବ କାର ବାଡ଼ି ?

শ্বেহলতা রাসিকতা করলেন - ডাঙ্গারবাবুর বাড়ি।

: কোন ডাঙ্গারবাবু?

: দন্ত ডাঙ্গার।

রিকশাওয়ালা মাথা চুলকাতে লাগল।

শচীনবাবু বললেন - কী হইল যাইবা ?

দন্ত ডাঙ্গারের বাড়ি চিনি না। আপনি চিনেন তো?

আগে 'দন্ত ডাঙ্গারের বাড়ি' বললে একবাকে হেন্ডল ঘুরিয়ে দিত। রিকশাওয়ালা, বনজীবী, গরীব মানুষগুলোকে নামমাত্র পয়সার বিনিময়ে চিকিৎসা করতেন। ঔষুধ, ইঞ্জেকশন, ড্রেসিং, অপারেশন। তিন চার টাকায় মিলিত এসব। ওরা দন্ত ডাঙ্গারকে মাথায় তুলে রাখত। এই ছ্যামরা কিছুই জানে না।

শচীনবাবু বললেন - আমাগো বাড়ি আমি চিনুম না? তোমার বাপেরে আমার নাম কইও, চিনতে পারবে।

শ্বেহলতা কিছুটা ক্ষেত্রে সুরে বললেন - আইজকালকার পোলাপানগুলি কোনও খবরই রাখে না। বৃদ্ধ দম্পত্তি রিকশায় চড়ে চললেন। খবর দিয়ে আসা হয়নি। বাসায় কেড়া আছে কে জানে?

শচীনবাবু বললেন - হারংরে একখান খবর দিয়া আইলে ভালো হইত। দুম কইরা আসাটা ঠিক হয়নি।

শ্বেহলতা বললেন - নারু আছে তো। অত চিন্তা কর ক্যান?

রিকশা চলল ছৱছৱিয়ে।

কদমকানন রেলগেট পেরিয়ে পুরো ধাঁধিয়ে গেলেন শচীনবাবু। স্নেহলতার অবস্থাও তথেবচা
সারি সারি দোকানপাট। মোটর গ্যারেজ, জুয়েলারি, সেলুন, গার্মেন্টস, ফুডস, ব্যাঙ্ক
পরিষেবা কত কী? সন্ধ্যার মুখে আলো মাখামাখি রাস্তা। বাহারি ল্যাম্পপোস্টের মাথায় চড়া
আলো। রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশ। নতুন রেললাইন বসেছে। গোটা শালবনটাও উধাও। বড়
অসহায় বোধ করলেন। স্নেহলতা বললেন -কী গো, ভুল রাস্তায় আইয়া পড়লাম না তো?

শচীনবাবু ধমক দিলেন - তুমি একটু থামবা? রাস্তায় চেনাজানা কাউরে পাইলে জিগায়ানিমু
নে।

রিকশাওয়ালা ছেলেটি বলল - ও দাদু, এবার কোনদিকে ?

শচীনবাবু চুপ, নিজের বাড়ির রাস্তাটা চিনতে পারছে না। আগে "ডাক্তারবাবুর বাড়ি" বললে
যে কেউ চিনতে পারত। আজ ডাক্তারবাবু নিজেই ডাক্তারবাবুর বাড়ি হারিয়ে ফেলেছেন।
রাস্তায় চেনা মানুষগুলো নেই। নতুন মুখ। নতুন সভ্যতা। সব তালিয়ে গেছে মাত্র কদিনের
ইতিহাসে।

শচীনবাবু বললেন - মনে হইতাসে কাছাকাছি আইয়া পড়েসি। কাঁচা রাস্তাটা পাইলেই
বাড়িটা পানু কী গো, কও না। স্নেহলতা বললেন - আরকুটু আউগ্যায় চল দেখি।

ছেলেটি আত্মাবাড়ি হ্যান্ডেল ঘোরালো। কাঁচাপথ নেই। চেনা আমবাগান, ঘোষদের একফালি
মাঠটা নেই। চেনা বাড়িগুলোও মাটি থেকে কারা যেন উপড়ে নিয়ে গেছে। নতুন নতুন
ঘরবাড়ি বসিয়ে দিয়ে গেছে। চোখের সামনে যা কিছু, সবই নতুন। কদমকানন এখন নতুন
একটি দেশের নাম।

ছেলেটি ঘুরে ঘুরে কাহিল। শচীনবাবু বললেন - চল, স্টেশনে ফিইর্যা যাই। আমাগো
বাসা হারাইয়া গ্যাছে গো।

ମେହଲତା ଇତିଉତି ଚୋଥେ ଖୁଁଜିଲେନ । ବଲଲେନ - ଅଯାନ୍ତୁ ଆଇଲାମ, କାରୁ ଲଗେତୋ ଦେଖା
ହଇଲ ନା ?

: ହଇବ ନା ।

: ହେଇଡା କୀ କଥା ?

ଶଚିନବାବୁ ବଲଲେନ - ତୋମାର ଆଓନେର ଆଗେଇ କଇମିଳାମ, ମାୟା କଇରୋ ନା । ମର
ଛାଇଡାଛୁଇଡା ଏକବାର ଚଇଲ୍ୟା ଆଇଲେ ଆର ଫିଟିର୍ଯ୍ୟା ଯାଇତେ ନାହିଁ । ଚଲ, ଯାଇଗା ।

ମେହଲତା ଅପଲକେ ତାକିଯେ ରହିଲେନ ଅଚେନା ପିଚ ରାସ୍ତାଟାର ଦିକେ । ରାସ୍ତାଟାର କୋନ ଦିକେ ଯେ
ତାଦେର ବାସ, ଆନ୍ଦାଜ ପେଲେନ ନା ।

(ସମାପ୍ତ)

স্বামীজির ভূতদৰ্শন

এবার একটা সত্যিকারের ভূতের গল্প বলব। এই ঘটনার ফিনি সাক্ষী হয়েছিলেন, তিনি একজন বিশ্ব বরেণ্য সন্ধ্যাসী। আমাদের সকলের নমস্য স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁরই জীবনী থেকে নেওয়া এই গল্পটি।

জয়পুর থেকে যাত্রা করেছেন স্বামীজী খেতড়ি অভিমুখে। দীর্ঘপথ চলেছেন উটের গাড়িতে। সঙ্গে রাজাসাহেব ও তাঁর অমাত্যবর্গ। সন্ধ্যা হয়-হয়, এমন সময় তাঁরা এসে পৌঁছলেন পিথমপুরীগঞ্জে। জায়গাটা মরুভূমির মাঝে এক 'পড়াওয়ে' অর্থাৎ পাহুঁশালা। দোকানপাট সবই আছে। আছে থাকা-থাওয়ার ব্যবস্থাও। যানবাহী পশ্চদেরও আন্তরিক আছে। মহারাজা স্বামীজীর বিশ্রামের জন্য পৃথক ঘরের ব্যবস্থা করেছেন। নৈশভোজ শেষ হলে সকলে শয্যা নিলেন। স্বামীজীও চুকলেন তাঁর ঘরে।

মরুভূমির রাত্রি গাঢ় হল। দিনের বেলা ভীষণ গরম হলেও রাত্রে হাওয়া বয় সেখানে। অনেকটা স্বচ্ছ। সারাদিন গরমে কষ্ট পেয়েছেন খুব, তাই শুয়েই স্বামীজি একটু তন্দুচ্ছন্ন হলেন। হঠাৎ যেন শুনতে পেলেন সশব্দে ঘরের দরজার পাল্লাদুটো খুলে গেল। হাওয়ার বেগ ঘরটাকে ভরিয়ে দিল। স্বামীজি ভাবলেন, তাড়াতাড়িতে হয়তো দরজায় খিল দেওয়া হয়নি। সেই কারণেই হাওয়ার বেগে পাল্লাদুটো খুলে গেছে। তিনি এ ব্যাপারে আর চিন্তিত হলেন না। ঘুমোতে চেষ্টা করলেন।

কিছুক্ষণ কাটল। তারপর দেখলেন, দরজার পাল্লাদুটো আবার নিজে থেকেই সশব্দে এঁটে গেল। এবারও তিনি চিন্তিত হলেন না। ভাবলেন হাওয়ার বেগেই তারা এঁটে গেছে। ভালোই হয়েছে। তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে চাইলেন।

ঘুম কিন্তু এল না। বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরেই অনুভব করলেন, কারা যেন তাঁর চৌকিটা নাড়াচ্ছে। তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। আর কোনো কম্পন নেই। ভাবলেন - তাঁরই মনের ভুল। আবার শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরেই আবার সেই চৌকির কম্পন। এবার স্বামীজী একটু চিন্তিত হলেন। কিন্তু উঠলেন না। ক্রমে চৌকির কম্পনবেগ বাড়তে লাগল। আর থাকতে না পেরে চৌকি থেকে মেঝেতে নামলেন তিনি। ঘরের লঠনটি নিয়ে ঘরের চারিপাশ ভালো করে লক্ষ্য করতে লাগলেন। কোথাও কিছু দেখতে পেলেন না।

বিছানায় এসে শুয়ে পড়লেন এবং ঘটনাগুলো নিয়ে ভাবতে লাগলেন। কিছুটা সময় কাটতেই বাইরে থেকে কাদের ফিসফিস কথাবার্তার শব্দ তাঁর কানে এল। তন্দ্রাবিষ্ট অবস্থায় স্বামীজী জানলার দিকে তাকাতে চাইলেন কিন্তু কিছুই দৃষ্টিগোচর হল না। তন্দ্রাবিষ্টই রইলেন, হঠাৎ মনে হল কারা যেন জানলার কাছে জমায়েত হয়ে তাঁকে কিছু বলছে। তন্দ্রা কাটিয়ে বিছানায় উঠে বসলেন স্বামীজি এবং হৃক্ষার দিয়ে জিজেস করলেন - "কে তোমরা?"

কিন্তু এবারও জানলায় কাউকেই দেখতে পেলেন না।

আবার শুয়ে পড়লেন বিছানায়। ঘটনাগুলো ভাবতে ভাবতে আবার তন্দ্রাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। স্বপ্নের ঘোরে এবার দেখলেন, আবার জানলার কাছে কতগুলো মুখ - কেমন যেন কালো কালো বিকৃত আকারের - তাদের মাথায় চুল নেই। তারা যেন বলছে, "স্বামীজি, আমরা বড় কষ্টে আছি। আমাদের উদ্ধার করুন, আমাদের কৃপা করুন"।

স্বামীজী স্বপ্নের ঘোরেই প্রশ্ন করলেন - "তোমরা কারা? কি চাও?"

কিন্তু তারপরেই স্বামীজীর ঘুমটা ভেঙে গেল। বিছানায় উঠে বসেছেন। তারপর দরজা খুলে বাইরে এলেন। চারদিকে তাকালেন, কোথাও কিছু দেখতে পেলেন না।

ততক্ষণে রাত্রি প্রায় শেষ। ভোরের আলো ফুটে উঠেছে পূর্বের আকাশে। বাইরে পায়চারি করতে লাগলেন স্বামীজি। সকাল হতে না হতেই রাজভূত্য চা নিয়ে হাজির হল স্বামীজির ঘরে। চা পান শেষ করেই স্বামীজী ছুটলেন পান্তিশালার মালিকের কাছে। তাঁকে রাত্রের সব ঘটনা খুলে বলার পর জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ব্যাপার বলুন তো? "

পান্তিশালার মালিক জানালেন, "কয়েক বছর আগে এক শীতের রাতে একটি পরিবারের সকলে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়।

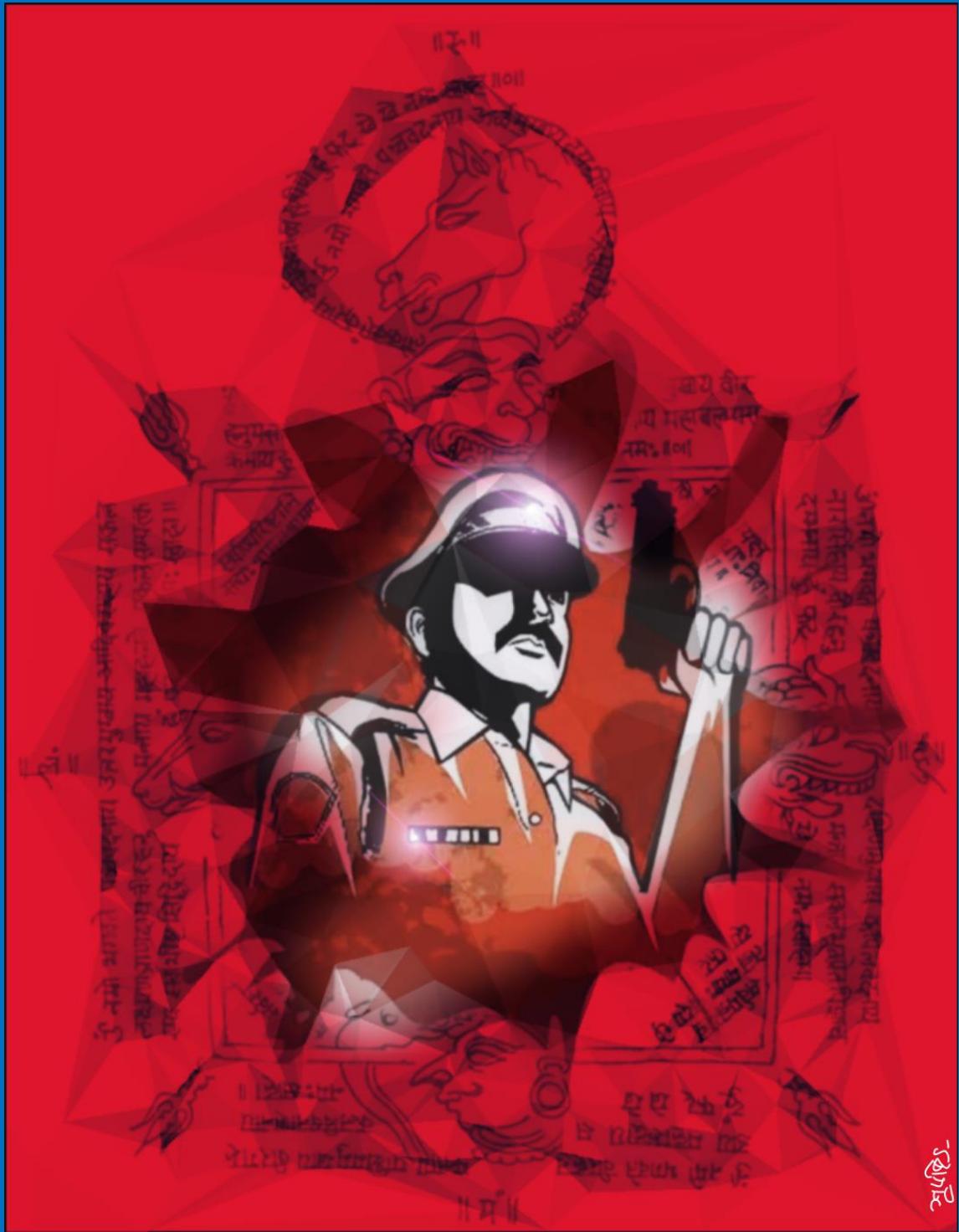
স্বামী-স্ত্রী আর তাদের একটি বাচ্চা। তাদের অত্থপ্ত আঘাত গত রাতে আপনার কাছে
মুক্তি প্রার্থনা করেছে"। পাহাড়শালা মালিকের কথাগুলো শুনতে স্বামীজীর মুখ
বিষণ্ণতায় ভরে গেল। তিনি তৎক্ষণাত্মে স্থানত্যাগ করলেন।



(তথ্যসূত্র : স্বামী বিবেকানন্দ (২ য ভাগ) প্রমথনাথ বসু, উঃ কাঃ ২০১২। পৃষ্ঠা ১৯৪)

[স্বামীজীর পরিচিত মুসারফ খানের দৌহিত্র ৮০ বছরের প্রবীণ খেতড়ি নিবাসী
আবদুল হামিদের প্রদত্ত তথ্য থেকে। এ ঘটনা তিনি তাঁর মায়ের মুখে শুনেছিলেন]

(সমাপ্ত)



|| অথঃ পিণ্ডাচ চরিতম ||

শুভজিৎ মুখাজ্ঞী

Nightmare

"স্যାର, ଡେଡ଼ବଡ଼ିଟା ଏଥିନୋ ଲାଓୟାରିଶ ପଡ଼େ ଆଛେ, କେଉ ଏଥିନୋ ନିତେ ଆସେନି !"-
 କନ୍‌ସ୍ଟେବଲ ବିମଲବାବୁ ଟେବିଲେର ଫାଇଲଗୁଲୋ କାଠେର ସେଙ୍ଗେ ଶୁଣିଯେ ରାଖିତେ
 ବଲଲେନ। ବଡ଼ବାବୁ ମାନିକ ଗାନ୍ଧୁଲୀ ରାଉଣ୍ଡେ ଗେଛିଲେନ, ଥାନାଯ ତୁକେ ରେନକୋଟଟା ଖୁଲିତେ
 ଖୁଲିତେ କିଛୁ ଭାବହିଲେନ ବୋଧହୟ, ପେଚନେର ଦିକ ଥେକେ ଆସା କଥାଗୁଲୋ ତାର କାନେ
 ଧାକ୍କା ଥେଯେ ଫିରେ ଗେଲୋ। ଏକଟୁ କ୍ଳାନ୍ତ ଦେଖାଚେ ତାକେ ଶ୍ରାବନେର ମାଝାମାଝି। ଅକ୍ଳାନ୍ତ
 ବୃଷ୍ଟିତେ ଶହର ପ୍ରାୟ ଡୁବିତେ ବସେଛେ। ଖୋଲା ଡ୍ରେନଗୁଲୋ ଆର ଜଳ ଗିଲିତେ ନା ପାରାଯ
 ଉଗରେ ଦିଚେ। କଯେକଦିନ ଧରେ ମାନିକବାବୁର ଶ୍ରୀର ଶରୀରଟା ଭାଲୋ ଯାଚେ ନା। ଦିନ ଦିନ
 କେମନ ଯେନ ଶୁକିଯେ ଯାଚେ ସେ। ଡାକ୍ତର, ବଦିୟ କତ କରେଓ ତୋ କିଛୁ ହଚ୍ଛେ ନା।
 ବିମଲବାବୁ ଅନେକଦିନ ହଲୋ ଏ ଥାନାଯ ଆଛେନ। ବଡ଼ବାବୁର ସବ ଖବରଟି ତାର ଜାନା,
 ବଲଲେନ- " ସ୍ୟାର ଆପନାକେ କେମନ ଅନ୍ୟମନକ୍ଷ ଦେଖାଚେହା!" ବଡ଼ବାବୁ ଖାନିକ ଚମକେ
 ଗିଯେ ପେଚନେ ଫିରେ ବଲଲେନ- " ନାହଁ, ତୁମି କିଛୁ ବଲିଛିଲେ? ଓହଁ, ଯାକ୍ ଓହଁ ବଡ଼ିଟା
 ତାହଲେ ଏଥିନୋ କେଉ କ୍ଲେମ କରେନି।

ବିମଲବାବୁ ମାଥା ନାଡ଼ିଲେନ। ବଡ଼ବାବୁ ହାତଘଡ଼ିତେ ଚୋଖ ବୋଲାଲେନ। ସାଡେ ନଟା
 ବାଜଛେ। ବୃଷ୍ଟିଟା ଧରଲେ ତାଓ କିଛୁ ଏକଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ଯେତା। ତାହାର ପଥଘାଟେର ଯା
 ଅବସ୍ଥା।

ଏଲାକାଯ ମାନିକ ଗାନ୍ଧୁଲୀର ବେଶ ନାମଭାକ ଆଛେ। ଶୁଦ୍ଧ ଥାନାର ବଡ଼ବାବୁ ବଲେ ନଯ, ତିନି
 ଏକଜନ ସମାଜସେବୀ ଓ ଛୋଟବେଳା ଥେକେ କତ ଅନାମୀ ଶରୀର, ଯାଦେର ମୁଖେ ଆଣ୍ଟନ

ଦେଓଯାର ନିଜେର କେଉ ନେଇ, ନିଜେର ହାତେ ଏରମ କତ ଯେ ଦାହ କରେଛେ ତାର କୋନେ
ହିସେବ ନେଇ।

ବିମଲବାବୁ ଦୁଟୋ ଗରମ ଧୌଁୟା ଓଠା ଚାଯେର କାପ ନିଯେ ଏସେ ଟେବିଲେ ରାଖଲେନ,
ଏକଟା ବଡ଼ବାବୁର ଦିକେ ଏଗିଯେ ଦିତେ ଦିତେ ବଲଲେନ- "ଏଥନ ତାହଲେ ଉପାୟ ସ୍ୟାର ?"

ହଠାତ୍ ମାଥାଯ ଏକଜନେର କଥା ଏଲୋ ବଡ଼ବାବୁରା ରିସିଭାରଟା କାନେ ନିଯେ ଏକଟା ନାସ୍ତାର
ଡାଯାଲ କରଲେନ। କିଛୁକ୍ଷଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହତ୍ୟାର ପର ହଠାତ୍ କାହେ କୋଥାଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦେ
ବାଜ ପଡ଼ିଲୋ, ଫୋନେର ଲାଇନଟା ଆଚମକା କେଟେ ଗେଲା।

"ଆଧଘନ୍ଟାର ମଧ୍ୟେ ଗାଡ଼ି ଏସେ ପଡ଼ିବେ ବିମଲବାବୁ, ତୈରୀ ହେଁ ନିନା!"- ରିସିଭାରଟା କାନ
ଥେକେ ନାମିଯେ ରେଖେ ବଲଲେନ ବଡ଼ବାବୁ ମାନିକ ଗାନ୍ଧୁଲୀ। ବିମଲବାବୁ ଚା ଟା ଶେଷ କରେ
ରୋନକୋଟଟା ପରତେ ବାଇରେ ଘରେ ଗେଲେନାପୁରୋ ଶହରଟାକେ ଅନ୍ଧକାର ଯେନ ହଜମ
କରେ ଫେଲେଛେ ବାଇରେ ଏକଘେଯେ ବୃଷ୍ଟିର ଶବ୍ଦଟା କାନସ୍‌ଓୟା ହେଁ ଗେହୋଟେବିଲେର
ପେପାରଓୟେଟଟା ହାତେ ନାଚାତେ ନାଚାତେ ମାନିକବାବୁର ମନ ଅନ୍ୟ କୋଥାଓ ଚଲେ ଗେଲା।
ଚଲେ ଗେଲ କିଛୁ ଫେଲେ ଆସା ସମୟେର ଖୋଁଜ ନିତୋକାହେଇ କୋଥାଓ ଆବାର ଖୁବ
ଜୋରେ ବାଜ ପଡ଼ିଲୋ। ସେଇ ଆଲୋତେ ଥାନାର ଏ ସରଟା ଏକବାର ସାଦା ହେଁ ଗିଯେ ଆବାର
କାଲୋଯ ଡୁବେ ଗେଲା।

Route 666

ଦୁର୍ଯ୍ୟଗେର ମଧ୍ୟେ ରାସ୍ତା ଦିଯେ ଏକଟା ଜିପେର ଆଲୋ ବୃଷ୍ଟିର ଫଳା କେଟେ ବଢ଼େର ଗତିତେ
ଏଗୋଛେ। ରାସ୍ତା ଟା ଜିପେର ଆଲୋଯ ଖାନିକଟା ଦୃଶ୍ୟ ହେଁ ଆବାର ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଁ ଯାଚେ।
ଗାଡ଼ିଟି ଚାଲାଚେନ ମାନିକବାବୁ ଆର ସଙ୍ଗେ ରଯେଛେ ଶ୍ରୀ ଅପର୍ଣ୍ଣ ଆର ତାଦେର ଛ ବଞ୍ଚରେ

ଛେଲେ ଅପ୍ନୀ ଉତ୍ତିଷ୍ଠିଲେ ପଡ଼ା ଜଳେର ଫୋଟାଙ୍ଗଲୋ ଦୁହାତ ଦିଯେ ସରିଯେ ଦିଚ୍ଛେ ଓ ଯାଇପାରା ହଠାତ ଗାଡ଼ିର ସାମନେ ଏକଟା ଖୁବ ଜୋରାଲୋ ଆଲୋ ଛାଡ଼ିଯେ ପଡ଼ଲୋ । କିଛୁ ବୁଝେ ଓଠାର ଆଗେଇ ଖୁବ ଦ୍ରୁତ ଏକଟା ବନ୍ତୁ କାଁଚ ତେଦ କରେ ମାନିକବାବୁର ଗା ଘେଁମେ ବେରିଯେ ଗେଲା । ଅବଶ୍ଵା ଅନୁମାନ କରେ ପେରେ ସିଟ୍ୟାରିଂ ସୁରିଯେ ହାଙ୍କା ବାଁକ ନିଯେ ଗାଡ଼ିର ଗତି ବାଡ଼ିଯେ ଦିଲେନ ତିନି । ଝାଡ଼େର ଗତିତେ ସେଇ ଜାଯଗା ପେଛନେ ଫେଲେ ଏଗିଯେ ଚଲଲୋ ଜିପଟା । ହଠାତ ପେଛନେର ସିଟ ଥେକେ ଏକଟା ଚିଂକାର ଶୁନେ ଆଚମକା ବ୍ରେକ କଷଲେନ । ଦେଖିଲେନ, ଅପର୍ଣ୍ଣ ଅପୁର ମାଥାଟା କୋଲେ ନିଯେ କାଁଦିଛେ ଆର ଅପୁର ଗୋଟା ଜାମା ରଞ୍ଜେ ଭିଜେ ଯାଚେ । ଆର ତିନି ଅସହାୟ ଚୋଥେ ତାକିଯେ ଆଛେନ ସେଇଦିକେ ।

"ସ୍ୟାର ଚଲୁନ , ଗାଡ଼ି ବାଇରେ ଦାଡ଼ିଯେ ଆଛେ"- ବିମଲବାବୁର ଡାକେ ଏକଟୁ ଚମକେ ଉଠିଲେନ ମାନିକବାବୁ । ପେପାର ଓ ଯେଟଟା ଟେବିଲେ ରେଖେ ତିନି ବଲିଲେନ- " ଚଲୁନ ।"

ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲେ ବଡ଼ାଲବାବୁ ଥାମିଲେନ । ଗୋଟା କ୍ଲାସ ଏକ୍ଷେବାରେ ଚୁପ । ଛାତ୍ରରା ମନ ଦିଯେ ଏତକ୍ଷଣ ଗଲ୍ଲଟା ଶୁନଛିଲ । ଓଦେର ଅବାକ ହୟେ ଯାଓୟା ଚୋଖଙ୍ଗଲୋ ଆର ମୁଖେର ଭଞ୍ଜି ଦେଖେ ବଡ଼ାଲବାବୁ ମୁଖେ ଏକଚିଲିତେ ହାସିର ରେଖା ଫୁଟେ ଉଠିଲୋ । କ୍ଲାସରୁମେର ବୋବା ନିଶ୍ଚୁପତା ଭେଦେ ପେଛନ ବେଢ଼େର ପରିମଳ ବଲିଲୋ- "ସ୍ୟାର, ତାରପର ?" ବଡ଼ାଲବାବୁ ମାଥା ନୀଚୁ କରେ କିଛୁକ୍ଷଣ ଭେବେ ଆବାର ବଲିଲେ ଶୁରୁ କରିଲେନ ।

No Exit

ବିମଲବାବୁ ରେନକୋଟଟା ଗାୟେ ଆଁଟୋସାଟୋ କରେ ଜଡ଼ିଯେ ଥାନାର ବାଇରେ ଏସେ ଦାଁଡାଲେନ । ଛିଟେଫୋଁଟା ବୃକ୍ଷିର ଛାଟ ତଥନୋ ଗାୟେ ଲାଗିଛେ । ଗାଡ଼ି ଓ ଯାଲା ମଙ୍ଗେ କରେ

ଆରୋ ଦୁଜନ କମବସୀ ଛେଲେକେ ଏନେହୋମାନିକବାବୁ ବାଇରେ ବେରିଯେ ଗାଡ଼ିଓୟାଲାକେ
ଡେକେ ବଲଲେନ- "ବିଶ୍ୱା, ଛେଲେଦୁଟୋକେ ଡେତର ଥେକେ ବଡ଼ିଟା ନିଯେ ଆସତେ ବଳ,
ସାବଧାନେ ଗାଡ଼ିତେ ତୁଳବି!"

"ଚିନ୍ତା କରବେନ ନା ସ୍ୟାର, ବୁଡ଼ିତଳାତେଓ ଦୁଜନ ଛେଲେ ପାଠିଯେଛି, ସବ ବ୍ୟବହାର
କରେ ଦେବେ"- ବିଶ୍ୱା ଏକଟା କ୍ୟାବଲା ହାସି ହେସେ ବିନ୍ୟେର ସୁରେ ବଲଲୋ। ଡେଡବଡ଼ିଟା
ଗାଡ଼ିତେ ତୁଲେ ଗାଡ଼ି ସ୍ଟାର୍ଟ ଦିଲୋ ବିଶ୍ୱାମାନିକବାବୁ ଆର ବିମଲବାବୁ ଚଲଲେନ ଜିପେ
ପେଛନ ପେଛନ। ଆକାଶେ ଏଖନୋ କାଳୋ ମେଘ, ତବେ ବୃଷ୍ଟିଟା ଏକଟୁ ଧରେହୋଅନ୍ଧକାର
ରାନ୍ତାଯ ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ଚାରଟେ ଆଲୋ ଚୋଖେ ପଡ଼ିଛେହଠାଏ ରାନ୍ତାର ଉପର ଦିଯେ ଏକଟା କାଳୋ
ଜିନିସ ପେରିଯେ ଗେଲାବୁଡ଼ିତଳା ଶୁଶାନ ଏଖନୋ ମାଇଲ ଦୁଇକ ବାକି, ରାତ ପ୍ରାୟ ପୌନେ
ଏଗାରୋଟା। ଏଦିକଟାଯ ସରବାଡ଼ି ଏକଟୁ କମ, ରାନ୍ତାର ଦୁପାଶ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଛେ ଢାକା; ଆକାଶ
ଛୁଯେଛେ- ପ୍ରହରୀର ମତୋ ଦାଁଡିଯେ ରଯେଛେ ବହୁକାଳ ଏଭାବେଇ। କାହେର କୁଁଡ଼େଘରେ ଏକଟା
ତେଲେର ବାତି ଚୋଖେ ପଡ଼ଲୋ, ସୀରେ ସୀରେ ସେଇ କ୍ଷୀନ ଆଲୋ ଅଞ୍ଚପ୍ରତି ହୟେ ମିଲିଯେ
ଗେଲ ନିକଷ ଅତୀତେ।

Heart

ସ୍ୟାର, ମିସ୍ଟାର ଗାଞ୍ଜୁଲୀ ଗୁଲିଟା ଆମରା ବେର କରେଛିଲାମ ତବେ ଖୁବ ବେଶୀ ଲିଙ୍ଗିଂ ହୟେ
ଯାଓୟାଯ ଆପନାର ଛେଲେକେ ବାଁଚାତେ ପାରଲାମ ନା।" ଡାକ୍ତାରେର କଥାଗୁଲୋ କେମନ ଯେନ
ଅଞ୍ଚପ୍ରତି ଶୋନାଚିଲ ମାନିକବାବୁରା। ଅପର୍ଣ୍ଣ ଖୁବ ଜୋରେ ଏକଟା ଚିନ୍କାର କରେ ଢଲେ
ପଡ଼ଲୋ, ମାନିକବାବୁ ଦୌଡ଼େ ଗିଯେ ତାକେ ଧରେ ଫେଲଲେନ। ସେଦିନ ଥେକେ ଅପର୍ଣ୍ଣ କେମନ

যେଣ ହୟେ ଗେଲାକିଛୁ ଖେତେ ଚାଯ ନା, କାରୋର ସାଥେ କଥା ବଲେ ନା, ଶୁଧୁ ଅପୁର ଖେଳନାଗ୍ନଲୋର ଦିକେ ତାକିଯେ ଥାକେ। ଓର ଛବିଙ୍ଗଲୋକେ ନାମିଯେ ବାରବାର ପରିଷକାର କରତେ ଥାକେ। ଓର ଶୂନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ଦିକେ ବେଶିକ୍ଷଣ ତାକାନୋ ଯାଯ ନା। ଦୁବଞ୍ଚର ହତେ ଚଲଲୋ କିନ୍ତୁ ଅପର୍ଣ୍ଣାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାର କୋନୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୟନି ଅପର୍ଣ୍ଣା ଯଦି ତାକେ ସରାସରି ଦୋଷାରୋପ କରତୋ ତାও ତିନି ସହ୍ୟ କରେ ନିତେନ, କିନ୍ତୁ ତାର ଏଇ ଦୀର୍ଘ ନିଷ୍ଠକ୍ଷତା ମାନିକବାବୁର ଭେତରଟା କୁରେ କୁରେ ଖାଯାମାକେ ମାକେ ମନେ ହୟ ଛେଲେର ମୃତ୍ୟୁର ଜନ୍ୟ ତିନିଇ କି ଦାୟୀ? ହଠାତ୍ ରାସ୍ତାର ଜଳେ ଭରା ଏକ ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ ସାମଲେ ବିମଲବାବୁ ଆଚମକା ପାଶ କାଟିଯେ ବେର କରଲେନ, ଗାଡ଼ିର ମୃଦୁ ଝାଁକୁ ନିତେ ମାନିକବାବୁର ସମ୍ବିତ ଫିରଲ।

Something wicked

ବୁଡ଼ିତଳା ଶୁଶାନେର ସାମନେ ସଥନ ଗାଡ଼ିଟା ସଥନ ଏସେ ପୌଛାଲୋ ତଥନ ଆକାଶ ମେଘ କେଟେ ପରିଷକାର। ନିର୍ଜନ ଶୁଶାନେର ଲାଗୋଯା ଏକଟା ଛୋଟ ପୁକୁର, ସେଇ ପୁକୁରେର ଜଳ ଏଥନ ରୀତିମତ ଉପଚେ ପଡ଼ିଛେ ମାନିକବାବୁ ଜିପ ଥେକେ ନେମେ ଏଗିଯେ ଗେଲେନ ବିଶ୍ୱଯାର ଗାଡ଼ିଟିର ଦିକେ। ଓଇ ଦୁଜନ ଛେଲେ ବଡ଼ିଟାକେ ଗାଡ଼ି ଥେକେ ନାମିଯେ ରାଖଲୋ, ତିନି ଏକଥାନା ସିଗାରେଟ ମୁଖେ ନିଯେ ଦେଶଲାଇ ଜ୍ଵାଲଲେନ। ଆଚମକା ବଡ଼ିର ଓପରେର ତାକା କାପଡ଼ଟା ସରେ ଗେଲା ଦେଶଲାଇଯେର ଆବହା ହଲୁଦ ଆଲୋଯ ତିନି ସେଦିକେ ତାକିଯେ ଚମକେ ଉଠଲେନ। ଏକଟା ଜୋରାଲୋ ହାଓଯାଯ ଦେଶଲାଇଟା ନିଭେ ଗେଲା।

ପେଚନ ଥେକେ କାଁଧେ ଏକଟା ହାତ ଠେକଲୋ-” ସ୍ୟାର, କି ଦେଖଛେନ ?” ମାନିକବାବୁର ମୁଖ
ଥେକେ ଏକଟା ଅଞ୍ଚୁଟ ଶବ୍ଦ ବେରୋଲୋ, ଠିକ ଶୋନା ଗେଲ ନା। ତିନି ଭାଲୋ କରେ
ତାକାଲେନ ସାମନେର ଦିକେ ,ଆଶ୍ଚର୍ଯ ! ବଡ଼ିଟା ନେହି?

ବିମଲବାବୁ ଆବାର ବଲଲେନ-” ସ୍ୟାର ବଡ଼ିଟା ଓରା ଭେତରେ ନିଯେ ଗେଛେ, ଚଲୁନ ଆମରା ଓଇ
ବେଦିଟାଯ ଗିଯେ ବସି। ମାନିକବାବୁ ଧୀର ପାଯେ ଯେତେ ଯେତେ ଅନ୍ୟମନଙ୍କ ହାତେ ସିଗାରେଟ୍ଟା
ପକେଟେ ଭରଲେନ, ତାହଲେ ଯା ତିନି ଦେଖଲେନ ସବଟାଇ କି ତାର ଚୋଥେର ଭୁଲ ବେଦିଟାର
ବାଁଦିକେ ପୁରୁଷଟା। ବିଶ୍ୱଯା ଆର ଛେଳେଣ୍ଟଲୋ କାଠ ସାଜାଚେ। ପରିଷକାର କାଳୋ ଆକାଶେ
ତଥନ ଚାଁଦ ଉଠେଛୋଚାଁଦେର ଆଲୋଯ ଶୁଶାନ ଟାକେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଭଗ୍ନପୂରୀ ବଲେ ମନେ ହଚ୍ଛେ
, ହାଙ୍କା ହାଓଯାଯ କରେକଟା ଛୋଟୋ ଗାଛ ମାଥା ଦୋଳାଚେ। ଚିତା ସାଜାନୋ ପ୍ରାୟ ଶେଷେର
ମୁଖେ, ମୃତ ଶରୀରଟା ଏକପାଶେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଶୁଇୟେ ରାଖା ଆଛେ। ଚାଁଦେର ଆଲୋଯ ଏବାର
ଭାଲୋଭାବେ ଦେଖଲେନ ମାନିକବାବୁ ; ଚୋଦ ପନେରୋ ବଛରେ ଏକଟା ଛେଲେ, କାଁଟା
ଛେଡାର ଦାଗ ଗୋଟା ଶରୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ, ସେଲାଇଣ୍ଟଲୋ ଶୁଧୁ ଚାମଡାଣ୍ଡଲୋକେ କୋନୋରକମେ
ଆଁକଡେ ରେଖେଛେ , ମାଥାର ବାଁଦିକେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ।

Sin City

ଏରମ ଅଭିଜଣତା ବହୁବାର ହେଯେଛେ ମାନିକବାବୁର , ଦାଗି ଆସାମୀ ଜନମନ କେ ଧରାର
ସମୟ ସେଇବାର ତାଦେର ଟିମ ରେହିଡ କରଛିଲ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ନିଷିଦ୍ଧପଲ୍ଲିର ବଣ୍ଡି

এলাকায়। পুলিশের একটা ইনফরমার খবর দিয়েছিল রায়পাড়ার ওই নিষিদ্ধপল্লিতেই জনসন লুকিয়ে আছে। পেছনে ধাওয়া করতে করতে মেজবাবু গুলি চালায় ওকে লক্ষ্য করে কিন্তু গুলিটা জনসনের না লেগে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এই ছেলেটার মাথায় লাগে, ঘটনাস্থলেই মারা যায় সো। ছেলেটার বাবা মা প্রচুর কানাকাটি করেছিলো পুলিশের কাছে। কিন্তু তাদের আর্থিক সামর্থ্য ছিল না বলে এ মামলা কোর্ট অব্দি গড়ায় নি। মানিকবাবু ওদেরকে অন্য ভাবে বুঝিয়ে পুরো ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। নামমাত্র একটা পোস্টমর্টেম করানো হয়। থানার তরফ থেকে ওর মা বাবাকে জানানো হয়। ছেলেটার আনুষ্ঠানিক সৎকার তারাই করবে, শাসিয়ে মুখ বন্ধ করা দেওয়া হয়। চিরকালের মতো।

Metamorphosis

বিমলবাবু এতক্ষণ পুরুরের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন। জলে একটা হাঙ্কা নড়াচড়ার শব্দ শোনা গেল। মানিকবাবুর চোখ ঘুরে গেল ওদিকে। তিনি দেখলেন বিমলবাবুর চোখ স্থির পুরুরের জলের দিকে। যেন অস্বাভাবিক কিছু একটা দেখতে পেয়েছেন। তার মুখ দিয়ে শুধুমাত্র দুটো কথা বেরোলো - "ওটা.....ওটা কি?" মানিকবাবুর পিঠ থেকে একটা হাঙ্কা হিমেল শ্রেত নেমে এলো, চাঁদের আলোয় দেখলেন একটা দীর্ঘ পুরুষাবয়ব জল থেকে উঠে আসছে, যার রোমহীন ফ্যাকাশে উলঙ্ঘ শরীরের

অবয়ব দিয়ে যেন ঝরে পড়ছে তীব্র ঘৃণা, তীক্ষ্ণ হিংস্র দৃষ্টি অবশ করে দিচ্ছে দেহের সমস্ত চেতনাচোখের মণি নেই, পুরোটাই কালো, গাঢ় অঙ্ককার দিয়ে ঘেরা এক বিভীষিকা এগিয়ে আসছে তাদেরই দিকে। মানিকবাবুর সমস্ত সত্ত্বা ধীরে ধীরে লোপ পেল। মানিকবাবুর ডানহাতটা ধীরে ধীরে নীচে নামলো, পকেট থেকে সার্ভিস রিভলবারটা বের করে জলের ওপর দিয়ে এগিয়ে আসা বীভৎস অবয়বটার দিকে তাক করে গুলি চালালেন, গুলিটা ঠিক লাগলো কিনা বুঝতে পারলেন না তবে আবার একটা মৃদু জলের শব্দে ছায়ামূর্তিটা মিলিয়ে গেল। এবার তিনি চকিতে পাশ ফিরে বিমলবাবুর উদ্দেশ্যে বললেন—“চলুন, এখানে থাকাটা আর ঠিক হবে না।” কিন্তু কোথায় কে, চারপাশ একেবারে ফাঁকা! এতক্ষণ কি তিনি একাই বসে ছিলেন এখানে? এবার ভয়ের মাত্রাটা ধীরে ধীরে বাড়ছে তার ভেতরে। কোনো দিকে না দেখে এবার তিনি ছুটতে শুরু করলেন শুশানের গেট লক্ষ্য করে, কিন্তু আচমকা কোনো শক্ত জিনিসে পা আটকে পরক্ষণেই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। মাটিতে পড়ে থাকা ধারালো ছোটো ছোটো পাথরে হাত আর পায়ের কিছু জায়গা ছড়ে গেল। কোনোভাবে হাতের ভয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন তিনি, পেছনে কয়েকটা পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে ঘুরে তাকাতেই দেখলেন চাঁদের আলোয় কয়েকটা পরিচিত মুখ। বিমলবাবু, বিশুয়া আর ছেলেগুলো তার দিকেই এগিয়ে আসছে আন্তে আন্তে। মানিকবাবুর চোখ ওদের মুখের দিকে তাকাতেই আটকে গেল, এ কি! কারো চোখের তারা নেই, সবটাই ঘন কালো, যেন অনেকদিনের জমাট বাঁধা অঙ্ককার ওদের চোখে আশ্রয় নিয়েছে আর প্রত্যেকের মুখে একটা ক্রুর হাসি লেগে রয়েছে, যেন সুযোগ পেলেই তারা তাকে মেরে ফেলতে একটুও দ্রিধা

କରବେ ନା ହଠାତ୍ କେ ଯେନ ତାର ଜାମା ଟେନେ ଧରେ ତାକେ ଛୁଡ଼େ ଫେଲେ ଦିଲୋ ଦୂରେ।
କାହେଇ କେଉ ଅଟ୍ଟହାସିତେ ଫେଟେ ପଡ଼ିଲୋ, କିନ୍ତୁ ହାସିଟା ପୁରୁଷ ନା ସ୍ତ୍ରୀଲୋକେର ବୋକା
ଗେଲ ନା ଠିକ କରୋସେଇ ଗୈଶାଚିକ ହାସି ଆକାଶ ବାତାସ ଛାପିଯେ ଶୋନା ଯାଚେ
ବହୁଦୂର। ଏବାର ମାନିକବାବୁ ଦେଖିଲେନ ମେହି ମୃତ ଫ୍ୟାକାଶେ ଶରୀରଟା ତାର ଦିକେ ଏକଦୃଷ୍ଟେ
ଥିଲା ହେଁ ଚେଯେ ଆହେ। ଏବାର ସେଟା ମାନିକବାବୁର ବୁକେର ଓପର ଚେପେ ବସିଲୋ।
ଚୋଥେର ଫ୍ୟାକାଶେ ମଣିହୀନ ଚାଉନି ଥିକେ ଝରେ ପଡ଼ିଛେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିହିଂସା ଦୁହାତ
ଦିଯେ ଏବାର ସେଟା ମାନିକବାବୁର ଗଲା ଚେପେ ଧରିଲୋ।

Dark Side of The Moon

ମାନିକବାବୁ ଚୋଥେ ଏକ ଏକଟା ଘଟନା ଛାଯାଛବିର ମତୋ ଚଲିଲା ଶୁରୁ କରିଲୋ। ମେଦିନ ଯେ
ଛେଲେଟି ମେଜବାବୁର ଗୁଲିତେ ମାରା ଯାଇ, ମେ ଜନମନେର ଛୋଟୋ ଭାଇ ଛୋଟୋବେଳା
ଥିକେ ପଡ଼ାଶୋନାଯ ଖୁବ ଭାଲୋ ହୋଇଥାଏ ବାହିରେର ଏକଟା ଭାଲୋ କଲେଜେ ଚାନ୍ଦ
ପାଯାତାର ଦାଦାକେ ମେ ଏକେବାରେଇ ପଚନ୍ଦ କରିଲୋ ନା। ମେଦିନ ଛୁଟିତେ ଘରେ ଏମେହିଲା।
ରାତ୍ରାଯ ଦାଦାକେ ଓହିଭାବେ ଦୌଡ଼ୋତେ ଦେଖେ ଆଟକାବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ।

ଭାଇ ପୁଲିଶେର ଗୁଲିତେ ମାରା ଗେଛେ ଶୁନେ ଜନମନ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଶୋଧେର ଇଚ୍ଛାଯ
ମେଦିନ ମାନିକବାବୁକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଗୁଲି ଚାଲାଯ କିନ୍ତୁ ଭୁଲବଶତ ଗୁଲିଟା ଗିଯେ ଲାଗେ
ତାର ଛେଲେ ଅପୁର ଗାଯେ।

মৃত শরীরটা এবার মানিকবাবুর চোখের সামনে গলে গলে পড়তে শুরু করলো। তিনি গলাচিরে চিংকার করতে চাইলেও তার মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বেরোলো না।

The Heaven Inside

"কি হলো স্যার ? বৃষ্টি ধরেছে, আর গাড়ি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, চলুন"- বিমলবাবুর ডাকে চমকে উঠলেন মানিকবাবু। চেয়ারে বসে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন খেয়াল নেই। কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছে তিনি চারপাশটা একবার ভালো করে চোখ বোলালেন। নাহ, তিনি সত্যি সত্যি থানাতেই আছেন।

"গাড়িটাকে ফেরত পাঠিয়ে দিন, আমরা ছেলেটার বড়িটাকে ওর পরিবারের হাতে তুলে দেবো।"- মানিকবাবু একনিঃশ্বাসে কথাটা বললেন।

স্কুলে পিরিয়ড শেষের ঘন্টা পড়লো। বড়লস্যার ক্লাস থেকে বেরোনোর জন্য উঠে দাঁড়ালেন। ছাত্রদের মনের প্রশ্ন গুলো তিনি ভালোভাবেই আন্দোজ করতে পারলেন। একজন জিজেস করলো- "স্যার, আপনি যে বললেন এটা ভূতের গন্ধ!

পরিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললো- " তাহলে কি স্যার পিশাচ বলে কিছু হয় না ? মানে এমন কিছু কী সত্যিই নেই?

"থাকে তো, মানুষের মনে।" এই বলে বড়লস্যার ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

(সমাপ্ত)

জাপানের অভিশপ্ত লোককথা

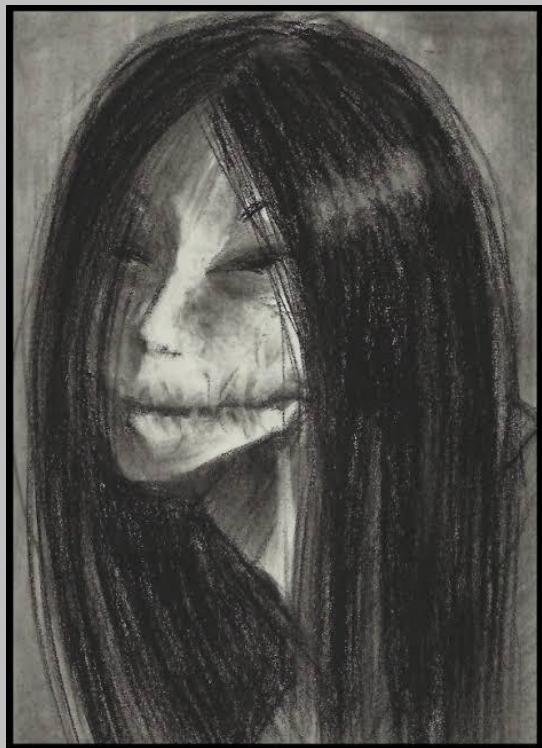
জাপানের লোককথায় হাজারো অতৃপ্তি আত্মার বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু আজকে যে ৫টি অতৃপ্তি আত্মার কথা বলতে যাচ্ছি যা শুধুমাত্র লোককথাতেই নয় বরং সেখানের শহরে মানুষের মুখে মুখে থাকে। এই ৫টি ভয়ানক আত্মাকে বলা হয় জাপানের ইতিহাসে সত্যিকার অতৃপ্তি আত্মা।



ওকিকু পুতুল

এই ওকিকু পুতুলটি আসলে একটি জাপানের পুতুল যা জাপানের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিহিত। এবং এই পুতুলটির মালিক ছিলেন ওকিকু নামের একটি ছোট মেয়ে। ছোট মেয়েটি অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় মারা যাওয়ার পর সকলের ধারণা হয় মেয়েটির আত্মা সেই পুতুলের মধ্যে তুকে গিয়েছে। সকলের এই ধারণার মূলে

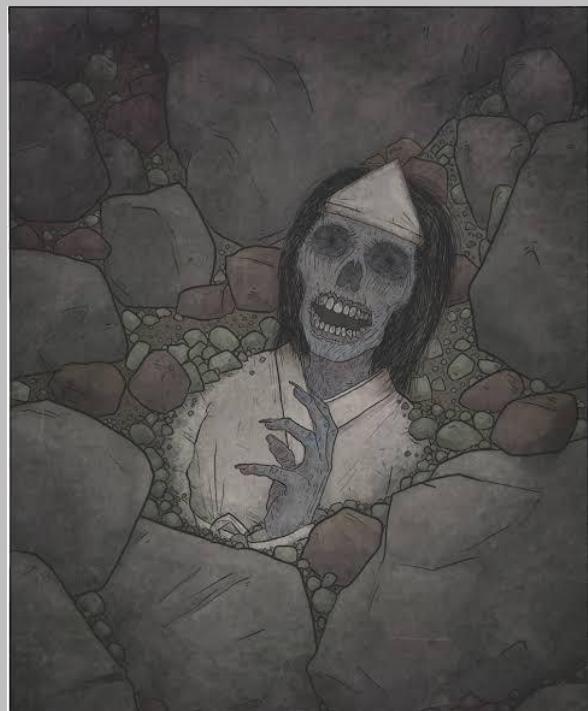
রয়েছে পুতুলটির চুল। কারণ মেয়েটি মারা যাওয়ার সময় পুতুলটির চুল ছোট ছিল।
কিন্তু বর্তমানে পুতুলটির চুল অনেক বড়। যেভাবে ছোট একটি মেয়ের চুল বাড়তে
থাকে ঠিক সেভাবেই প্রতিনিয়ত বেড়েছে পুতুলটির চুল যার ব্যাখ্যা বিজ্ঞান দিতে
পারেনি। পুতুলটি বর্তমানে ‘মানেঞ্জি মন্দিরে রয়েছে।



কুচিসাকে ওন্না

এই নামের অর্থ হচ্ছে ‘ওমান উইথ স্প্লিট মাউথ’/ মুখ কাটা যে নারীর। জানা মতে,
এই নারীকে গভীর রাতে একলা চলতি পথে দেখা যায়। তার পরনে থাকে ট্রেঞ্চ
কোট এবং মুখ ঢাকা থাকে সার্জিকাল মাস্কে। একলা কাউকে পেলে ছট করে

সামনে এসে জিজ্ঞেস করে, ‘আমি কি দেখতে সুন্দর?’ যদি উত্তর না হয় তবে সে কাচি দিয়ে মাথা কেটে ফেলে। আর যদি উত্তর হ্যাঁ হয় তবে সে তার সার্জিকাল মাস্কটি সরিয়ে তার এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত কাটা মুখ দেখিয়ে বলবে, ‘এখন?’ আপনার উত্তর না হলে মরতে হবে এবং উত্তর হ্যাঁ হলে তার নিজের মতো কাটা দাগ সে পথিকের মুখে তৈরি করে দিয়ে যাবে।



হিতোবাশিরা

হিতোবাশিরার ইংরেজি অর্থ ‘হিউম্যান পিলারস’ অর্থাৎ মানুষের স্তন্ত। জাপানে অনেক আগে মনে করা হতো কোনো ব্রিজ, বিল্ডিং তৈরির সময় পিলারে মানুষ

ব্যবহার করলে তা মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। আর সে কারনেই তারা পিলারের
ভেতরে জ্যান্ত মানুষ পুঁতে ফেলতো। তাদের ধারনা ছিল এভাবে মানুষ পিলারে
গেঁথে উৎসর্গ করলে সৃষ্টিকর্তা খুশি হবেন এবং তাদের বিন্দিং মজবুত হবে। এভাবে
যতো কিছু তৈরি করা হয়েছিল তার প্রত্যেকটিতে প্রেতাভ্যার দেখা পাওয়া গিয়েছে
বলে জানা যায়।



দ্য গার্ল ফ্রম দ্য গ্যাপ

দ্য গার্ল ফ্রম দ্য গ্যাপ একটি অত্থপ্ত আভ্যাস যাকে ঘরের আসবাবপত্রের ফাঁকে
দেখতে পাওয়া যায় হঠাতে করেই। যদি কারো সাথে তার চোখাচোখি হয়ে যায় তবে
সে সম্মোহন করে তাকে জিজেস করে, ‘আমার সাথে লুকোচুরি খেলবে?’ এবং
এভাবেই সে খেলার ছলে টেনে নিয়ে যায় অন্য কোনো স্থানে যেখানে যাওয়া এবং
ফিরে আসা একেবারেই সম্ভব নয় মানুষের পক্ষে।



টেকে টেকে

‘টেকে টেকে’ শুধুমাত্র হাতের ওপর ভর দিয়ে চলাচলের সময় যে আওয়াজ হয় তার সাথে নামকরণ করা হয়েছে এই অতৃপ্তি আত্মাটির। লোকমুখে জানা যায় এই আত্মাটি একজন সুন্দরী মেয়ের যিনি রেলগাড়ির সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন (অথবা দুর্ভাগ্যবশত রেলগাড়ির সামনে পড়ে যান)। এতে করে পুরোপুরি মাঝ বরাবর দুটুকরো হয়ে যান তিনি। এরপর প্রায়ই তাকে দেখা যায় নিজের অর্ধেক শরীর নিয়ে হাতের ওপর ভর দিয়ে একলা পথে চলা মানুষের সামনে চলে আসতে। এবং সে নিজের অবস্থাতেই পরিণত করেন পথিকটিকেও।



(সমাপ্ত)



শুক্রবর্ষ ভূত

অজয় গাঙ্গুলী

খুকু খেলছিল, একাই। বাবা-মা দুজনেই কাজে চলে যায়। ঠান্ডাও একাজ-ওকাজে
ব্যস্ত, তাই খুকুর কাছে খেলনার বড় একটা গামলা দিয়ে রেখেছে। খুকু নিজের
মনেই বকবক করে। কোন পুতুলকে ধমক দেয়, কারোর উপর রাগ দেখায়। আর
খিদে পেলে সামনে রাখা দুধের বোতল চোষে, তেষ্টা পেলে জলের বোতল।
মাঝেমধ্যে অবশ্য কোন বিশেষ পছন্দের পুতুলকেও জল কিন্তু দুধ খাওয়ায়। বলে,
"খেয়ে নাও সোনা, না হলে ভূতে ধরবে!"

তারপরই পুতুলটাকে শুধায়, "হ্যাঁরে, তুই ভূত দেখেছিস? ওমা, ভূত কি তুই
জানিসই না! শোন, ভূত হল একটা মানুষ, এই তোর বা আমার মতো।" এরপর
কথার খেই হারিয়ে ফেলে, অন্য কিছু নিয়ে ব্যাস্ত হয়ে পড়ে।

হঠাৎ খুব জোরে দরজার আওয়াজ। খুকু চমকে তাকিয়ে দেখে একটা ছেলে এসে
ওর সামনে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে।

- তুমি কে?
- আমি? আমি ভূত।
- ধূর বোকা। খুকু খিলখিল করে হেসে ওঠে।
- কেন? আমাকে ভূত মনে হচ্ছে না? বলে ভূত মিলিয়ে যায়।
- টুকি! খুকু আবার হাসতে থাকে।

এরপর খুকুর ঘুম পেয়ে যায়। মেঝেতেই ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের ঘোরে খুকু ভূতটাকে আবার দেখতে পায়। ফাঁকা মাঠ, কেউ কোথাও নেই। ভূতের কাছে অনেক বাচ্চা, খুকুর বয়সী, ওর থেকেও বড় বা ছোট। ভূত বলে ওঠে - " তোমাদের মা-বাবা বকে?"

- হ্যাঁ।

- কেন বকে?

সবাই চুপ, কারণ কেউ নিজের দোষ সবার সামনে বলবে না। ভূত আবার মিটিমিটি হাসতে থাকে।

- তোমরা ঘরে যা যা দুষ্টুমি করে বকা বা মার খাও সেগুলো করতে পারো। কেউ তোমাদের বকবে না।

শুনেই সবাই হটোপুটি করে প্রথমেই দৌড়াতে শুরু করল। বাচ্চাদের চিংকারে কান পাতা দায়। আধঘঢ়টা পর দেখা গেল কেউ হাঁপাচ্ছে, কেউ হাতে-পায়ে ছড়িয়ে কাঁদছে। কেউ আবার বায়না করছে - "আমি বাড়ি যাব।" ভূত সবাইকে শান্ত করল। যার যার আঘাত লেগেছিল হাত বুলিয়ে ঠিক করে দিল।

- দেখো, এখানে থাকলে তোমাদের বকা বা মার খাওয়ার ভয় নেই। তোমরা যে যা খুশি করতে পারো। এবার বল, তোমরা এখানে থাকবে, না ঘর ফিরে যাবে।

- আমরা ঘর যাব। সবাই একসাথে বলে উঠল।

ভূত আবার হেসে বলল, " আচ্ছা, তোমরা সবাই ফিরে যাও। কিন্তু সবাই কথা দাও যে বাবা-মায়ের কথা শুনবে ও মন দিয়ে লেখাপড়া করবে।

- ହଁଁ।

ଖୁକୁର ସୁମ ଭେଙ୍ଗେ ଯାଯା ମା ଓର ମାଥାଯ ହାତ ବୁଲିଯେ ବଲେ, " କି ରେ, ସୁମେର ଧୋରେ ଅତ ଚିତ୍କାର କରଛିଲି କେନ?"

- ମା, ଆମି ଆର ଦୁଷ୍ଟମି କରବ ନା ଖୁକୁ ମାଯେର କୋଳେ ସେଧିଯେ ଯାଯା।
- କୀ ବ୍ୟାପାର, ମା ହେସେ ବଲେ, ହଠାତ ଆମାଦେର ଖୁକୁ ଏତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେଯେ ହୟେ ଗେଲ?
- ନା ମା, କିଛୁ ନା ମା, ଭୂତ ମାନେ କି?
- କେନ ମା? ତୋମାକେ ଭୂତେର କଥା କେ ବଲଲ, ଠାନ୍ମା?
- ବଲ ନା ମା, ଭୂତ କି?

ମା ହେସେ ବଲଲେନ, "ଭୂତ ହଲ ତୋମାର ଖେଳାର ସାଥୀ ଠାନ୍ମା ବଲେନ ନା, ଭୂତ ଆମାର ପୁତ, ପେନ୍ତି ଆମାର ଝି/ରାମ-ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୁକେ ଆଛେ, ଭୟଟା ଆମାର କି?"

ଖୁକୁ ମାଯେର ମୁଖେର ଦିକେ ତାକିଯେ ଭାବେ, ମା କି ସୁନ୍ଦର !

(ସମାପ୍ତ)



অঙ্গুত ভূত

দুঃখিত রঞ্জক

ভূত মানে অতীত বা গত। যা গত হয়ে গেছে তাই ভূত। বিশেষ করে যারা পরলোক গত তাদেরকে কেন্দ্র করে ভূতের চিন্তা।

পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, গাছপালা প্রভৃতি গত হলেও কানে চিন্তার বিষয় হয় না। কিন্তু মানুষ গত হয়ে আবার ফিরে এলেই মহাচিন্তা। এই অচিন্তনীয় চিন্তাই ভূতের অনুভূতি জাগায়। মানুষ হয়ে যায় ভূত-প্রেত-পেত্রী। আর আমরা তাদের কাছে হই পরাভূত। কিন্তু পঞ্চভূতে বিলীন মানুষেরা ফিরে আসে কিনা তা জানা নেই আর এলে পরেও বর্তমান বিজ্ঞানমনক্ষ মানুষেরা ভীত হয় না। যাক সেসব ব্যাপার। ছোটবেলায় দাদু ঠাম্বির মুখে শোনা একটি অঙ্গুত ভূতের কাহিনী তোমাদের না বলে থাকতে পারলাম না। সেই কাহিনী আমাকে অভিভূত করেছে।

সে অনেক কালের কথা। বিজ্ঞানের দানে সমাজ পরিপূষ্ট হয়নি। ফলে সমাজে নানান কুসংস্কার, বাড়ফুঁক, তুকতাক মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মহামারী অনায়াসে গ্রামের পর গ্রাম করতো গ্রাস। ছিলো না চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি। তাই মানুষ মারা যেতে বিনা চিকিৎসায়।

এমন একটি পরিবেশে আমাদের গ্রামে নেমে এসেছিলো কলেরা মহামারী। ধীরে ধীরে গ্রাস করতে লাগলো গ্রামের পর গ্রাম। নিরূপায় মানুষ প্রাণ দিয়ে কলেরার সঙ্গে মোকাবিলার চেষ্টা করছে। বিপর্যয়ের মাঝেও জয়ের চিন্তা করছে। একদিন এভাবেই কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলো হারান মন্ডল। মৃতদেহটিকে সৎকার বা দাহ করার সামর্থ্যও মানুষ হারিয়ে ফেলেছে। অগত্যা গভীর জঙ্গলে সে মৃত দেহকে পুতে ফেলে রোগের প্রকোপ থেকে গ্রামকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়েছে। অপারগতার দরুন এই করুণ পরিস্থিতিতে গ্রামবাসীদের কয়েকজন মিলে হারান মন্ডলের মৃতদেহ কবরস্থ করার জন্য গভীর জঙ্গলে নিয়ে গেলো। কবর খুঁড়ে ফেলা হলো। এমন সময়ে শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি। অগত্যা মরাটিকে কবরের পাশে শায়িত রেখে যে ঘার ঘরে ফিরে আসে।

একটু পরে বৃষ্টি থেমে গেলো। গ্রামের সকল পুরুষেরা মনসা মাতার মন্দিরে জমায়েত হলো। এমন সময় ঘোষণা করা হল একটি প্রতিযোগিতার কথা। যে হারান মন্ডলের মৃতদেহকে হলুদ লাগিয়ে দিয়ে আসতে পারবে তাকে করা হবে পুরস্কৃত। একথা শুনে সবাই চুপ। বাপরে অমাবস্যার রাত্রে গভীর জঙ্গলে তাও আবার মরার গায়ে হলুদ। সে তো এখন ভূত হয়ে গেছে। এসব কথা ভেবে নেমে এলো নিষ্কৃত। এমন সময়ে শিবু সর্দার এগিয়ে এসে বললো, “আমি যাব, আমাকে হলুদ দিন। আমি মরার গায়ে লাগিয়ে আসব।”

তার হাতে হলুদ দেওয়া হলো। শক্ত মুঠিতে ধরে ছুটে চললো শিবু। ঘারে অমাবস্যা, আকাশে ঘন কালো মেঘ, কন্টকাকীর্ণ পথ, হিংস্র জন্মদের মহানন্দে মরা তুলে খাওয়ার শব্দ। এসব উপেক্ষা করে উদ্দাম সাহসে ছুটে চললো শিবু। শিবুর যাওয়া দেখে গ্রামবাসীদের কয়েকজন শিবুর ভারী আশঙ্কার কথা চিন্তা করে অগোচরে পিছন পিছন যেতে লাগলো। অবশেষে গলদঘর্ম অবস্থায় শিবু উপনীত হল সেই নির্দিষ্ট স্থানে।

ଦେଖିଲୋ କବର, ପାଶେ ହାରାନ ମନ୍ଦଲେର ମୃତଦେହ। ସାଦା ଚାଦରେ ମୋଡ଼ା। ଆର ଦେରୀ ନୟ। ଏଦିକ ଓଦିକ ତାକିଯେ ଶିବୁ ମୃତଦେହେର ଚାଦରେର ନିଚେ ଆଣ୍ଟେ ଆଣ୍ଟେ ହାତ ତୁକିଯେ ହଲୁଦ ମାଖାତେ ଶୁରୁ କରିଲୋ। ଅମନି ମରାଟା ଜାପଟେ ଧରିଲୋ ଶିବୁକେ। ଆର ନାଁକି ସୁରେ ବଲତେ ଲାଗିଲୋ, “ଭାଁଲୋଇ ହଲୋ, ଆର ଆମାକେ ଏକା ଯେଁତେ ହିଁବେ ନାଁ”

ଶୁରୁ ହଲୋ ଜାପଟାଜାପଟି। ଶେଷେ ଶିବୁ ଭୟେ ଚିକାର କରିଲେ ଲାଗିଲୋ, “ଓଗୋ କେ ଆଛୋ ଗୋ? ଆମାଯ ବାଁଚାଓ ଗୋ ! ଆମାଯ ଭୂତେ ମେରେ ଫେଲିଲୋ ଗୋ”

ବଲିଲେ ବଲିଲେ ଅଚୈତନ୍ୟ ହୟେ ପଡ଼ିଲୋ। ଯାରା ପିଛନେ ପିଛନେ ଆସିଛିଲ ତାରା ସବାଇ ଏଲୋ। ଏମେ ଶିବୁର ଚୋଖେ-ମୁଖେ ଜଲେର ଛିଟି ଦିଯେ ଜ୍ଞାନ ଫେରାଲୋ।

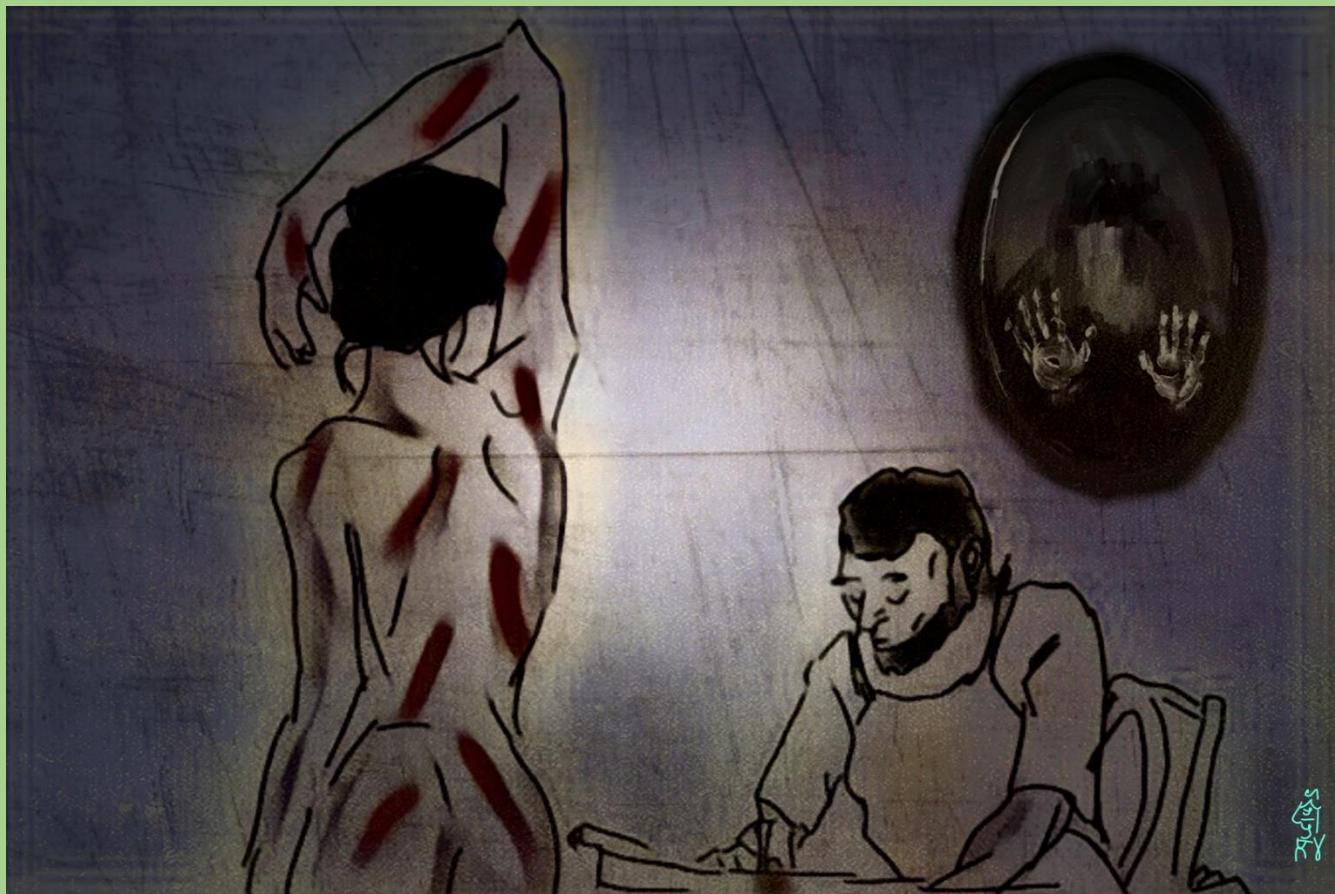
“ଭାଗିଯ୍ସ ତୋମରା ଏଲେ, ନାହଲେ ମାରାଇ ଯେତାମା ଏର ମରା ଜ୍ୟାନ୍ତ ହୟେ ଆମାକେ ତାର ମଙ୍ଗେ ନିଯେ ଯାଓଯାର ଜନ୍ୟ ଗଲା ଟିପେ ଧରେଛିଲୋ। ଯାକ ବାବା ଏ ଯାତାଯ ବେଁଚେ ଗେଲାମା”

ଶିବୁର କଥା ଶୁନେ ସବାର ବୁକ କାଁପିଲେ ଶୁରୁ କରିଲୋ। ରାମୁ ବଲିଲୋ, “ଆର ଭୟ ନେଇ ଆମରା ତୋ ଅନେକଜନ ଆଛି। ଚଳ ଚଳ ଯା ହଓଯାର ହୟେ ଗେଛେ, ଏବାର ମରାଟାକେ କବରଙ୍ଗ କରେଇ ଯାବା।” ସବାଇ ମିଲେ ମରାକେ ଧରେ ବଲିଲୋ, “ବଲୋ ହରି , ହରି ବୋଲା!”

ହଠାତ୍ କେ ଏକଜନ ବଲିଲୋ, “ହ୍ୟାଁରେ ମରାର ଗା ଟା ତୋ ଗରମ ବୋଧ ହଚ୍ଛେ। ମରା ତୋ ଠାନ୍ଡା ହୟେ ଯାଓଯାର କଥା। ତାହଲେ ହରେନ କି ବେଁଚେ ଗେଲୋ? ଆଚା ଚାଦରଟା ଉଠିଯେ ଦ୍ୟାଖ ତୋ” ଯେଇ ନା ଚାଦରଟା ସରାନୋ ହଲୋ ସବାଇ ସମସ୍ତରେ ଚିକାର କରେ ଉଠିଲୋ, “ଆରେ ହରେନ କୋଥାଯ ? ଏ ତୋ ପରାନ ବାଉରି ରୋ” ଏବାର ପରାନ ବାଉରି ଉଠେ ବସେ। ତାର ହାସି ଆର ଥାମେ ନା। ହାସିଲେ ହାସିଲେ, “ଆମାଯ ମାଫ କରବେନ। ଶିବୁର ଆସାର କଥା ଶୁନେ ଆମି ଆଧୁନଟା ଆଗେଇ ଛୁଟେ ଏମେ ମରା କେ ସରିଯେ ଚାଦର ଚାପା ଦିଯେ ଶୁଯେ ପଡ଼େଛି। ଓହି ଦ୍ୟାଖୋ ଓଖାନେ ହରେନର ମରା ପଡ଼େ ଆଛେ”

ଶୁନେ ସବାଇ ପରାନେର ସାହସର ବାହବା ଦିଲେ ଲାଗିଲୋ। ତାରପର ମରାକେ କବରଙ୍ଗ କରେ ସବାଇ ଗ୍ରାମେ ଫିରେ ଏଲୋ। ପୁରଙ୍ଗୀତ କରା ହଲୋ ଦୁଜନକେଇ।

(ସମାପ୍ତ)



৪৮

জীবন্ত পোট্টেট

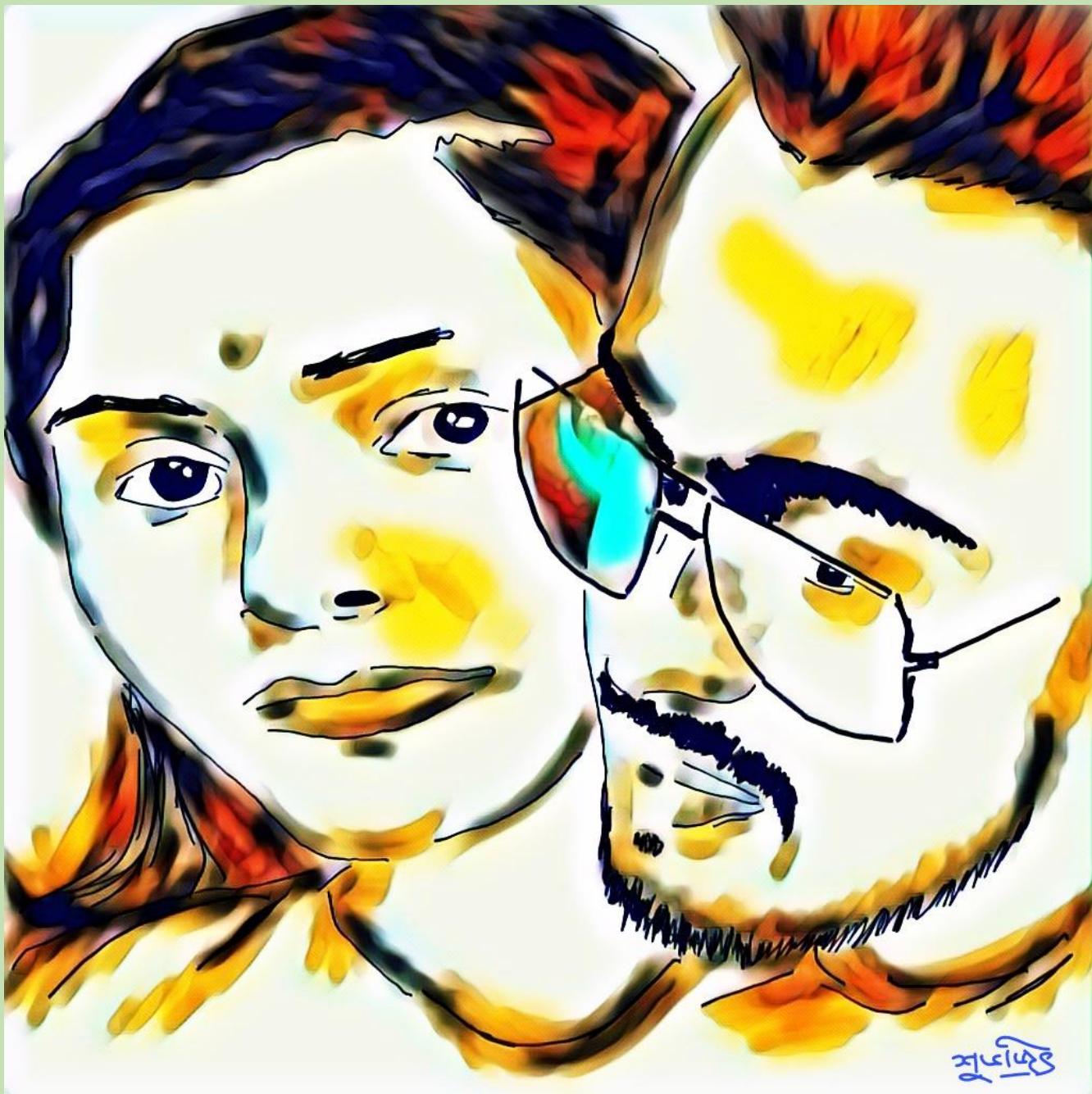
অনিন্দিতা ব্যানার্জী

রিয়া এতদিন গ্রামে থেকেছে। সেখানের এক হাই স্কুলে রিয়া পড়াশুনা করতো। পড়াশোনাতে মন্দ ছিল না সো বাড়িতে মা, বাবা, সে আর তার ছোট ভাই থাকতো। তার বাবা গ্রামের এক ছোট মিলে কাজ করতো। কিন্তু হঠাতে যেন তাদের পরিবারে দুঃখের কালোছায়া নেমে এলো। রিয়ার বাবা মারা গেলেন। তাদের সুখ আর সংসার মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে তচনছ হয় গেল।

রিয়া সবে মাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। তার স্বপ্ন শিক্ষিকা হবে কিন্তু সে স্বপ্ন আর তার পূরণ হলো না। কিছু দিনের মধ্যে ঘরে অভাব শুরু হয়ে যায়। ঠিক এই সময় তার মা-ও শারীরিক ভাবে খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। রিয়া তার ছোটভাইটার মুখের দিকে তাকাতে পারে না। সে ঠিক করে যে গ্রামে তাদের সম্পত্তির সব কিছু বিক্রি করে তারা কলকাতা চলে যাবে। কিছু দিনের মধ্যে রিয়া তার মা ও ভাইকে নিয়েই কলকাতায় চলে আসে আর সেখানের এক ছোট দুকামরার ভাড়া বাড়িতে থাকতে শুরু করে। সেখানেও রিয়া কাজ খুঁজতে থাকলেও পায় না। এত কম শিক্ষায় কে তাকে কাজ দেবে? হঠাৎ এক দিন এক ব্যক্তির সাথে তার পরিচয় হয়। তিনি রিয়াকে একটা কাজ দেবেন বলে কথা দেন। রিয়া মনের দিক থেকে এই কাজ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না কিন্তু তার টাকারও খুব দরকার। একপ্রকার বাধ্য হয়েই রাজি হয় সে। সপ্তাহে মাত্র তিন দিনের কাজ। সে রাজি হয়ে যায়। সে ব্যক্তি অনেক রাতে রিয়াকে ডেকে পাঠায়। একজনের বাড়িতে রিয়াকে পাঠানো হবে। এক ট্যাঙ্কি তাকে সে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। রিয়ার সামনে বিশাল বড় বাড়ি। সে ভয়ে ভয়ে খোলা মেইন ডোর পেরিয়ে দোতলার লম্বা মার্বেল মোড়া সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে থাকে। পুরো বাড়িটাই অন্ধকারে ঢাকা। হঠাৎ রিয়ার হাত ধরে কেউ যেন হ্যাঁচকা টান মারলো। এক ব্যক্তি। তার গোটা মুখ দাঁড়িতে ভর্তি। গায়ের রক্ত হিম করে দেওয়া চেহারা তার। সে ব্যক্তি তাকে সামনে রাখা একটা টুলে বসতে বললো। ঠিক সে সময় রিয়া লক্ষ্য করলো সেই ঘরটা পুরো বড়ো বড়ো পোট্রেটে ঠাসা আর সেগুলোর উপরে সাদা পর্দা দেওয়া। লোকটা তাকে কিছু খেতে দিলো। রিয়া বললো- "আমি কিছু খাবো না আপনার যা করার করতে পারেন।" লোকটা আর জোর করলো না। রিয়া-ও শরীরের আবরণ খুলে নগ অবস্থায় বসে পড়লো।

রিয়া বুঝতে পারলো তার শরীর হঠাতে অবশ হয়ে যাচ্ছে। লোকটি পোট্টের সাদা পর্দাগুলো সরিয়ে ওদিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললো- "এ সব ছবি গুলো আমার আঁকা। ছবিগুলোর প্রত্যেকটা কোন না কোন মেয়ের। এগুলোর মধ্যে আমি তাদের আত্মাদেরকে আটকে রেখে দিয়েছি। আমি এতে এক অন্তুত সুখ পাই। চিন্তা কোরো না তোমাকেও এই ভাবে বন্দি করবো আমার ছবির মধ্যে।" মুহূর্তের মধ্যে রিয়ার বুকে একটা তীক্ষ্ণ কিছু চুকে বেরিয়ে গেল। শরীর ভেসে যেতে লাগল লালচে রঞ্জ আর সেই রঞ্জ দিয়ে লোকটা তার ছবি আঁকা শুরু করলো। রিয়াও সেই ঘরে চিরকাল থেকে গেল লোকটার কালেকশনের জীবন্ত পোট্টে হয়ে।

(সমাপ্ত)



ত্বু মনে রেখো

অভীক সেন

আজ ভাইফোঁটা। সীমা দের বাড়িতে তার তোড়জোড় চলছে। শেফালি সকাল থেকে তার ভাইয়ের জন্য নানা রকম রান্না করেছে। কিন্তু অনন্য সবকটা ছুটির দিনের মতো আজও দেরী করে ঘূম থেকে উঠেছে। দিদি যে না খেয়ে বসে আছে জানা সত্ত্বেও দেরী তে উঠেছে। সীমা রেগে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে, ফোনে রিং করে করে ঘূম ভাঙিয়ে দিয়েছেন ছেলের। অনন্য মুখ ভার করে বাধ্য ছেলের মতো স্নান করতে চুকে গেছে বাথরুমে। শেফালি রান্না শেষ করে স্নান করে ঠাকুরের পুজো দিয়ে ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করছে। সাতরকম মিষ্টি, ভাইয়ের পছন্দের নোনতা খাবারের আয়োজন করেছে শেফালি। সীমা বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। অনন্য তৈরী হয়ে আসার পর শেফালি সীমা কে ডাকলো 'মা এসো'।

'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা' মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে ফোঁটা দেওয়া সম্পন্ন করে ভাই কে ধান দুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করার সময় প্রতিবারের মতো এবারও কেঁদে ফেললো শেফালি। অনন্য এসব হবে জানে। তাই শেফালির পায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে তাকে হাসাবার চেষ্টা করে। সুড়সুড়ি খেয়ে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায় শেফালির। সীমা চেয়ারে বসে শাঁখ বাজাচিলেন। এখন দিদি-ভাইয়ের কান্দ দেখে নিজেও মুচকি হেসে শেফালি কে জিজাসা করলেন 'হ্যাঁ রে, এবারেও কাঁদলি? এখনো স্বাভাবিক হতে পারলি না? অন্তুত বাবা!'

শেফালি হাসি থামিয়ে বললো 'তোমরা আমায় যা দিয়েছ মা, তাতে এখন আমি
আনন্দে কাঁদি। দুঃখে কাঁদার দিন শেষ করে দিয়েছো তো তোমরা।' বলে ভাই কে
জড়িয়ে ধরলো শেফালি।

অনন্যও দিদিকে জড়িয়ে ধরে পিঠে হাত বুলিয়ে বলে 'প্রগাম তো করবো না জানিস,
ওসব বিশ্বাস করি না। দাঁড়া।'

এই বলে সে তার ঘর থেকে একটা প্যাকেট ভর্তি বই উপহার দিল দিদি কে। আনন্দ
কান্না মেশানো মুখে উপহার দেখে শেফালি বললো 'তুইতো এই দিনে হাজার
বললেও কিছু নিবি না, আমি আমার সাধ্য মতো কিছু কি দিতে পারিনা?'

অনন্য বলে 'এই দিনে সবথেকে বড় উপহার তো এই মঙ্গলফৌঁটা টা, অন্য উপহার
কেন নেব বল তো? আর সাধ্য? যার মানুষ কে ভালবাসার সাধ্য আছে তার অন্য
সাধ্য লাগে না।'

সীমা এদের কথা শুনতে শুনতে অন্যমনক্ষ হয়ে সামনের আয়নায় নিজের
প্রতিফলন দেখতে লাগলেন।

সূর্য তখনও অস্ত যায়নি, আজকের মতো ছুটি নেবার আগে আকাশে তার লাল
উপস্থিতি জানান দিচ্ছে। আকাশের কোণে একটু একটু মেঘ করেছে। কয়েকদিন
ধরে কলকাতায় খুব গরম পড়েছে। রোজ একটু একটু মেঘের দেখা পাওয়া যাচ্ছে
কিন্তু বৃষ্টি যেন মজা দেখছে। শহরের একটা পার্কে এখন অনেক তরুণ তরুণীদের

ভিড়, তারা তাদের এই একান্ত নিজস্ব সময় টুকু নিরালায় কাটাতে চাইছে, কিন্তু
কলকাতা শহরে নিরালার অভাব থাকায় ভিড়ের মধ্যেও নিজেদের একা মনে করে
নিতে হচ্ছে। চারপাশে আর কিছু নেই মনে করলেই তো হল, আমি চোখ বুজলে
আর কেউ আমায় দেখতে কিনা তা আমি তো আর দেখতে পাবো না। এমন মধুর
সন্ধ্যায় আর কেউ তেমনভাবে নজর করলে বুঝতে পারতো সীমা আর সোমনাথ
মোটেও নিরালায় প্রেমালাপ করছে না, অথচ একটু আগে পর্যন্ত তাদের মুখে হাসি
ছিল, তারা একটা মিষ্টি সন্ধ্যা কাটাবে বলে অনেকদিন থেকেই ভাবছিল। তারা
এলো, হাসলো, দুজনে দুজনের হাত ধরলো, তারপর যেই সীমা বললো তার স্ফুলের
কাজ টা হয়ে গেছে, আজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়েছে সে, সোমনাথের হাসি
টা বোধহয় একটু পালটে গেল। সীমা সেটা লক্ষ্য করলো কিন্তু অতটা বিশেষ ভালো
নিল না। তাই তারপরই জিজ্ঞাসা করলো 'কি গো তুমি খুশি হওনি?' পার্কের ঝিলের
জলের দিকে তাকিয়ে সীমা বলতে লাগলো 'সেই ছোট থেকে লড়াই করছি, এমন
কি বাবা মায়ের পরিচয় টাও জানি না। শুধু কপালে ছিল বলে হোমে থেকে
পড়াশোনা করতে পারলাম।' চোখের কোণায় আসা অল্প জল মুছে সোমনাথের
দিকে তাকিয়ে বললো 'বলো, আজ এই দিন টা আমার কাছে আনন্দের হবে না?'

সোমনাথ একটু গন্তব্যির হয়ে বললো 'এটা তো সরকারী কাজ, বেশ ভালোই মাইনে।
কিন্তু আমি তো একটা কাজ করি, তোমাকে তো বলেছিলাম তোমার কাজ করার
দরকার নেই। আর কটাদিন পর আমি তোমাকে বিয়ে করে নেবো।'

সীমা এই কথাগুলোর জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে অবাক হয়ে বললো 'তোমার চাকরি
আছে বলে আমি চাকরি করবো না কেন? আমাকে বিয়ে করার জন্য যেমন তোমার

কাজ করা টা দরকার, তেমনই তোমাকে বিয়ে করার জন্য আমাকেও তো কাজ করতে হবে। এটাই তো হওয়া দরকার!"

সোমনাথ একটু বাঁকা হাসি হেসে বললো 'বাবু, হেবি নারীবাদী হয়ে উঠেছো তো। কেন গরীব কেরানির বউ বলে নিজের পরিচয় দিতে লজ্জা করতো?'

সীমা তার কোঁচকানো ভ্র সমান করে একটা ঢোক গিলে বললো 'আমি শুধু কারোর বউ, এটাই আমার একমাত্র পরিচয় নয়।'

সোমনাথ ও সীমা দুজনের চোখেই বোধহয় একটু ধূলো উড়ে এলো। চারপাশ টা একটু একটু করে ঠাণ্ডা হচ্ছে। কালৈশাখী বোধহয় আজ হবেই।

৩

'আপনার কাছে একটা বিশেষ অনুরোধ নিয়ে এসেছি দিদি।'

স্কুলে বেরোবার জন্য সীমা তৈরী হচ্ছিলেন। সকালের রান্নাবান্না শেফালিই করে। সীমা স্নান সেরে তৈরী হয়ে খাবার টেবিলে আসার সাথে সাথেই কলিং বেল বেজে উঠলো। সীমা গিয়ে দরজা খুলতে তিনি দেখলেন পাশের বাড়ির মিসেস মিত্র এসেছেন। সকালবেলা বেরোবার সময় কেউ এলে একটু বিরক্তি বোধ হয় সীমার। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে 'আসুন' বলে তারপর বসতেও বলতে হয়।

হাসি হাসি মুখ নিয়ে মিসেস মিত্র বসে বললেন 'জানি অসময়ে এলাম। কিন্তু রাত্রেও তো আপনি অনেক দেরীতে ফেরেন, তখন তো আবার রান্না, খেতে দেওয়া থাকে।

আজ আমার কর্তা অফিসে যাবেন না। তাই এখনি এলাম মেয়ে টা কে মশলা টা করতে বলে। বলছি কি দিদি, জানি হয়তো এভাবে বলা ঠিক নয়, কিন্তু মেয়ের মাতো, চিন্তা তো হয়ই বলুন না, আমার মেয়ে টা কে নেবেন দিদি আপনার ছেলের জন্য? মেয়ে টার রঙ টা একটু কালো কিন্তু জানেন তো ও সব কাজ পারে, খুবই শান্তিশিষ্ট ভদ্র। আপনি এতদিনের চেনা।'

বলে মিসেস মিত্র থেমে গেলেন। সীমার শান্ত কিন্তু তীব্র চোখের চাহনি দেখে তিনি বোধহয় একটু গুটিয়ে গেলেন।

সীমা সেটা বুঝতে পেরে চোখ টা শান্ত করে বললেন 'আমার ছেলে যাকে বিয়ে করবে তাকে চাকরি করতেই হবে দিদি। এটা আমার আর আমার ছেলে দুজনেরই ইচ্ছে। আর একটা কথা বলি আপনাকে, কিছু মনে করবেন না, আপনার মেয়ে পড়াশোনা জানে, খুবই ভালো ব্যবহার ওর। তা আপনি এভাবে ছুটে এসেছেন কেন? মেয়েকে স্বাবলম্বী হতে দিন।'

মিসেস মিত্র বললেন 'ও তো চাকরির চেষ্টা করে কিন্তু পাচ্ছে না, তাই ভাবলাম বিয়ে টাই যদি দিয়ে দেওয়া যায়।'

শেফালি ঘরের বাইরে থেকে এসব কথা শুনছিল কিন্তু ভেতরে আসেনি। অনন্য এখনও ঘুমোচ্ছে, ওর শরীর টা আজ একটু খারাপ। তাই ছুটি নিয়েছে।

সীমা একটু হেসে বললেন 'আজ যদি আমার ছেলে চাকরি না করতো, আপনি কি সম্ভব টা আনতেন? সেটা মেয়েদের জন্যেও প্রযোজ্য দিদি। কেন ছোট করছেন মেয়ে টাকে, নিজেদেরও করছেন। ওকে চেষ্টা করতে দিন নিজের পায়ে দাঁড়াবার।'

তখনই বিয়ে দেবেন যখন ও-ও সমান ভাবে ওর বরের পাশে বিপদে দাঁড়াতে
পারবে।'

মিসেস মিত্র মুখ টা ভারী করে নীচের দিকে নামিয়ে রাখলেন। সীমার কথায় লজ্জা
পেলেন নাকি মেয়ের মাকে মাথা নত করতেই হয় সেইজন্য সেটা সীমা বুকাতে
পারলেন না।

সীমা এবার মিসেস মিত্রের হাত ধরে বললেন 'কিছু মনে করবেন না দিদি, আসলে
এভাবে মানুষ কে ছোট হতে দেখলে খারাপ লাগে, তাই বলে ফেললাম। আর
তাছাড়া আমার ছেলের বিয়ে ঠিক করা আছে, অনেকদিন থেকেই।'

এই কথা শোনার পর মুখটা আরো থমথমে করে 'আমারই উচিত ছিল আগে সবটা
জেনে তারপর আসা। আচ্ছা চলি' বলে চলে গেলেন মিসেস মিত্র।

সীমার মনের ভেতরে কোথায় যেন একটা কষ্ট হচ্ছিল। যারা নিজেদের নিঃস্ব ভাবে,
এতদিন ধরে মেনে আসছে সেটাই, তাদের যদি আজ হঠাতে কেউ বলে না
তোমারও অনেক কিছু আছে পাথরে পাথরে ঠুকে আঙ্গন তো একটু জ্বলবেই।
সীমার সংবিত ফিরলো শেফালির ডাকে।

শেফালি দরজা গোড়া থেকেই বললো 'মা, ভাত দেবো?'

সীমা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

স্কুলের পর হোমের কিছু কাজ সেরে বাড়ি ফিরে ছেলের ঘরে গিয়ে দেখলেন অনন্য এখন ঠিক আছে। চার পাঁচবার ফোন করে খবর নিয়েছেন তিনি। শেফালি আছে বলেই ছেলের জন্য তিনি নিশ্চিন্ত এখন। অনন্য ল্যাপটপে করছে দেখে ছেলেকে একটু আদর করে দিলেন তিনি। জিজ্ঞাসা করলেন 'পেটে আর ব্যথা হয় নি তো? কতবার বলেছি বাইরের খাবার খাস না।' অনন্য মায়ের পেটের মধ্যে মুখ গুঁজে হেসে ওঠে।

সীমা পরিষ্কার হয়ে এসে বসে শেফালি কে বললেন 'শেফালি শোন, বোস এখানে।' 'হ্যাঁ মা বসছি, দাঁড়াও, তোমাকে কিছু খেতে দিই আগো।'

সীমা বিরক্ত হয়ে বললেন 'উফ আমার খাবার আমি নিয়ে নেবো, তুই এখানে বোস। তোর ভাইয়ের বিয়ের ব্যবস্থা টা এবার শুরু করি। সব যখন ঠিকই আছে তখন দেরী করে লাভ নেই। আমারও তো বয়েস হচ্ছে। মনুলা দের বাড়ি তে একটা ফোন করি। শেফালি প্রায় আনন্দে নেচে উঠে সোফায় বসে পড়ে বললো 'শিগগির ফোন করো মা, আমার তো আর তর সইছে না।'

ফোনে কথা বলে সীমা ছেলের ভাবি শৃঙ্খরবাড়ির সবাই কে কাল নিমন্ত্রণ করলেন। কাল রবিবার। সীমা ঠিক করলেন কাল দুই বাড়ি থেকে বিয়ের কথাবার্তা সব ঠিক করে নেবেন। রাতে শুয়ে এই সব কথা ভাবতে ভাবতে খাটের পাশে রাখা টেবিল থেকে ফোটোফ্রেম টা নিয়ে সৌরভ আর নিজের ছবি টা দেখতে লাগলেন। চারবছরের সব সূত্র তাঁর চোখ ভিজিয়ে দিল।

বিশ্বাসের জায়গায় একবার আঘাত লাগলে সেই জায়গায় সবসময়েই একটা চিনচিনে ব্যথা হতেই থাকে। কখনো তা সামনে আসে, কখনো আসে না। সামনে না এলে নিজেকে পোড়ায়, সামনে এলে সবাইকেই জ্বালায়। তবু জীবন মানে এগিয়ে চলা, একটু মানিয়ে নেওয়া এটাই মনে করে সীমা আর সোমনাথ আবার কাছাকাছি এসেছিল। এক রবিবারে ওরা আবার দেখা করার কথা দিয়েছিল। স্কুলের চাকরি টা পেয়ে সীমা একটু একটু করে টাকা জমায় এখন। হোমে থাকার জন্য কিছু খরচও সে তুলে দিতে পারে ম্যানেজমেন্টের হাতে। তার বাবা মায়ের পরিচয় নেই, এই হোমের মানুষ গুলোই তো তার আপনজন। আর আছে সোমনাথ। পড়াশোনায় ভালো বলে যখন হোম থেকে তার কলেজে পড়ার ব্যবস্থা করা হলো আর সে নিজেও যখন জলপানি পেল, সেই কলেজ থেকেই সোমনাথের সাথে আলাপ। তারপর একটু একটু করে পরিচয়, তারপর ঘনিষ্ঠতা। একে অন্যকে মন দিয়ে বসা। কিন্তু মানুষ যতই মুখে বলুক সর্বস্ব দিয়ে ভালবাসার কথা, সব দিয়ে দিলে ভাল টা আর বাসবে কি করে! তাই সোমনাথ আর সীমা সেদিন অতটা ঝগড়া করেছিল। আজ আবার মিটিয়ে নেবার জন্য তারা এসেছে। সোমনাথের এক বন্ধু আছে, তার বাড়ির টেলিফোনে বুথ থেকে ফোন করে দেয় সীমা, সেই বন্ধুই খবর দিয়ে দেয় সোমনাথ কে। আজও সেইভাবেই তাদের দেখা হলো। এই কদিনের একটা দমবন্ধ করা কষ্টের পর একটু ঠাণ্ডা বাতাস। সোমনাথ হোমের সামনে এসে দুদিন দাঁড়িয়েছিল। সীমা জানলা থেকে দেখে আর বেরোয় নি। সেটা কিছু টা রাগে, কিছু টা কেউ যদি দেখে নেয় সেই ভয়ে। আজ সেই অব্যক্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে

তারা। সোমনাথ আজ একটু দেরী করে ফেলেছিল। পার্কে এসে দেখে সীমা আগেই এসে গেছে। কিন্তু সোমনাথ আনন্দিত হতে পারলো না। কারণ সীমা একটি ছেলের সাথে হেসে হেসে কথা বলছে। তারপর ছেলে টা হাত বাড়িয়ে দিল, সীমাও হাত বাড়িয়ে দিল। সোমনাথের ভেতরের আগুন গন্গন করে জ্বলে উঠলো। ছেলে টি চলে যেতেই সীমার কাছে এসে সোমনাথ জানতে চাইলো 'কে ছেলে টা?'

সীমা হাসি হাসি মুখ নিয়েই বললো 'ওমা, তুমি চিনতে পারোনি? কলেজে পড়তো আমাদের সাথে, সাত্যকি গো। মনে নেই?'

সোমনাথের ওসব মনে করার সময় বা চেষ্টা বা ইচ্ছে কোনোটাই ছিল না, কারণ সাত্যকি কলেজের বন্ধুই শুধু নয়, সাত্যকি একটা ছেলে।

সোমনাথের ভেতর থেকে গরম লাভা বেরিয়ে এসে মানুষের কঢ়ে বলে উঠলো 'রাস্তায় দাঁড়িয়ে আজকাল অন্য ছেলের হাত ধরা হচ্ছে, সাধে বলে মেয়েছেলে কে মাথায় তুললে সর্বনাশ হয়!'

সীমা কয়েক মূহূর্ত হতবাক হয়ে থাকে। সব ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাওয়ার এই তো চেহারা! সীমা মুখ টা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে 'আজকের পর তুমি আর আমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রেখো না, আমি সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলাম।' বলে সীমা চলে আসছিল, কিন্তু সোমনাথ কোনো জবাব দেবে না এত বড় অপমান টার। সোমনাথ সীমার হাত টা ধরে মুচকে দেবার চেষ্টা করে বলে 'কি, কি হয়েছে? এখন কি বড় মাচার লাউ ধরেছো নাকি?'

পাকে সবার মাঝে নিরালা খুঁজে নেওয়া মানুষ গুলো হয়তো খেয়াল করেও করেনি যে সীমা ব্যথা পেয়ে হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে আর সোমনাথ মনের সুখে হাত মচকে দিচ্ছে, যেন হাতের মাধ্যমে গোটা মানুষ টাকেই মচকে দিচ্ছে সে। সোমনাথের ধরা সীমার বাঁ হাত টা সে তার ডান হাত দিয়ে ছাড়ানোর জন্য চেষ্টা করছিল, সেই চেষ্টাটাই এবার সোমনাথের গালে একটা চড় বসালো। সোমনাথ এই চরম অপমান সহ্য করার লোক নয় কিন্তু সীমার দৃশ্টি কঠস্বরে সোমনাথ কেও এবার থমকে যেতে হয়। সীমা ধীর কিন্তু গন্তীর কঢ়ে জানায় 'এরপর থেকে আমায় বিরক্ত করলে তোমার জায়গা হবে জেল, এটা মনে রেখো'। বলে সীমা চলে এসেছিল। সোমনাথের ভেতরে তখনো দাউ দাউ কান্ড, সীমা কে না পেয়ে নিজেকেই বুঝি পুড়িয়ে দিতে চায় সো।

৫

রবিবার নিম্নলিঙ্গের মাধ্যমে পাঁজি থেকে শুভ দিন দেখা হয়ে গেল। মৃদুলা দের বাড়ি থেকে একজন আধুনিক হোতা কে নিয়ে আসা হয়েছিল, যিনি একটু অন্যরকম ভাবে বিয়ে টা দেবেন। ঠিক হলো ১২ ই অগ্রহায়ণ বিয়ে হবে। বিয়ের দিন ঠিক হবার পর কত কাজ। বিয়ে টা তো কয়েক ঘন্টার মধ্যেই হয়ে যাবে। কিন্তু তার আয়োজন করতেই অনেক দিন লাগবে। সীমার তরফ থেকে হোম, তাঁর স্তুলের কলিগ রা, অনন্যর বন্ধুবান্ধব সহকর্মীরা আর কয়েকজন প্রতিবেশী। তাঁদের তো আর কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। বিয়ের দিন ঠিক হবার পর পরই শেফালি ভাইকে কাতুকুতু দিয়ে হাসিয়ে দিয়েছে। অনন্যও লজ্জা পেয়ে মাথা নীচু করে নিয়েছে। কিন্তু আর এক

ଜୋଡ଼ା ଚୋଖ ଅନନ୍ୟ କେ ଦେଖିଲ ଖୁବ ମନ ଦିଯେ। ହାସତେ ହାସତେ ଅନନ୍ୟ ତାର ଦିକେ ଚାଇତେ ତାଦେର ଚାରପାଶେ ହୟେ ଚଳା ଏତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କୋଥାଯ ଯେନ ହାରିଯେ ଗେଲ। ତାଦେର ଚାରଦିକେ ଏଥିନ ଶୁଦ୍ଧୁଇ ଯେନ ଏକରାଶ ଜୋନାକି ଉଡ଼େ ବେରାଚେଛ। ଅନନ୍ୟର ଚୋଖ ମିଶେ ଯାଚେଛ ମୃଦୁଲାର ଚୋଖେର ସାଥେ, ମୃଦୁଲାର ହଦୟ ମିଶେ ଯାଚେଛ ଅନନ୍ୟର ହଦୟେ, ଚୋଖ ଯେନ ହଦୟ ନାମକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଟା କେ ଦେଖିତେ ପାଚେ।

ମୃଦୁଲାର ମା ସୀମା କେ ବଲଲେନ 'ଏରା ଦୁଟୋ ତୋ ବିଯେ ନିଯେ ମାଥାଇ ଘାମାଯ ନା। ଆଜ ହବେ କାଳ ହବେ କରେ ଆର ହୟେ ଓଠେ ନା। ଆପଣି ଯେ ଏହି ତୋଡ଼ଜୋଡ଼ କରଲେନ, ଏହିବାର ଏକଟା କାଜେର କାଜ ହବେ।'

ସୀମା ବଲଲେନ 'ହଁ ଅନେକଦିନ ହୟେଛେ, ଏବାର ସଂସାରୀ ହତେଇ ହବେ। ଆମାଦେରଓ ତୋ ବଯେସ ହଚ୍ଛେ ଦିଦି।'

ରେଖା ବଲଲେନ 'ଠିକଇ ତୋ। ତାଇ ଏକେବାରେ ଆପନାର କଥା ମତୋ ନିଯେ ଚଲେ ଏଲାମ ଏହି କଙ୍କନା କେ। ଆଜକାଳ ନତୁନ ଏକରକମ ବିଯେ ଦିଚ୍ଛେ ଓରା, ଆରୋ ଅନେକେଇ କରଛେନ ଏମନ ବିଯେ, ଶୁନେଛେନ ନିଶ୍ୟା। ଯାତେ ବର ବୁଝେଇ ସମାନ ସମାନ ଅଧିକାର ବଜାଯ ଥାକେ।'

ସୀମା କଙ୍କନାର ଦିକେ ହାତ ଜୋଡ଼ କରେ ନମଞ୍ଚାର କରେ ବଲଲେନ 'ଦାର୍ଢଳ କାଜ ଏଟା। ଆଚ୍ଛା ଏବାର ଦିନ ଟା ତୋ ଦେଖା ହୋକ।'

ମୃଦୁଲାର ମା ରେଖା ବଲଲେନ 'ହଁ ଏକଦମ। ଆମରା ତୋ ଭାବତେଇ ପାରି ମେଯେ ଟା କୋନୋଦିନ ଆବାର ଏକଟା ସ୍ଵାଭାବିକ ଜୀବନ ପାବେ। ଯା ଝାଡ଼ ବୟେ ଗେଲ ଓର ଓପର ଦିଯେ।'

মৃদুলা আর অনন্যর সংবিত ফিরে এসেছে ততক্ষণে। তারা এখন আবার বাস্তবের মাটিতে।

সীমা বললেন 'কেন ভাবতে পারেন নি। ও কোনো অন্যায় করেনি, ও প্রতিবাদ করেছিল। যার লড়াই করার এত মনের জোর সে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না সে কি হয়?' বলে হেসে তিনি মৃদুলার দিকে তাকালেন। মৃদুলা অনন্যর মায়ের প্রতি প্রথম থেকেই গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতো, আজও এই মানুষটির কথায় চোখের কোণ টা চিকচিক করে উঠলো ওর।

মৃদুলার বাবা আনন্দ বললেন 'তা যা বলেছেন ম্যাডাম। এটা আমাদের কাছেও চ্যালেঞ্জ। আমরা মা বাবা-রা আমাদের সন্তানদের সুখী দেখতে চাই। আর তাদের পাশে থাকা টা আমাদের প্রধান কর্তব্য। অনন্য আর মৃদুলার মতো স্প্রোটিং ছেলেমেয়ে দের জন্য তো আমাদের গর্ব হয়।

এটা বলতেই মৃদুলা তার বাবার কাঁধে মাথা রাখে।

রেখা হেসে বলেন 'আমাদের কিছু আত্মীয় কে বলেছিলাম জানেন। তারা তো রীতিমতো অবাক হলো, নাক সিঁটকালো। তারা তো ভেবেই নিয়েছিল ওর আর বিয়ে হবে না।'

অনন্য এতক্ষণ সব কিছু শুনছিল। কিছু বলেনি। তবে এবার বললো 'কে কি বলছে, ভাবছে তা মনে করে আমরা তো আর বসে থাকতে পারি না আন্তি। আর তাছাড়া ওর তো বিয়ে হচ্ছে না, ও বিয়ে করছে আমাকে, যেমন আমিও ওকে বিয়ে করছি।

সীমা অনন্য আর শেফালি কে দুহাত দিয়ে বুকে টেনে নিয়ে বললেন 'এভাবেই
এগোক না, এগোনো নিয়ে কথা, দুজনের সুখে থাকা নিয়ে কথা। আমরাই পারবো
দাঁড়িয়ে থেকে ওদের সেই সুখের রাস্তা টায় পৌঁছে দিতো।'

প্রতিভাজের পর মৃদুলা রা বাড়ি চলে গেল। অনন্য রাত্রিবেলা ঘুমতে যাবার আগে
মায়ের কাছে এসে মাকে জড়িয়ে ধরলো।

সীমা ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

অনন্য সীমা কে জিজ্ঞাসা করলো 'মা, তোমার মতো মা না পেলে আমি কি
করতাম? সারাজীবন দক্ষে মরতে হতো হয়তো। এত সহজে কি করে মানতে
পারলে মা?'

সীমা ছেলের মাথা তে হাত বুলোতে বুলোতে সৌরভের ছবি টার দিকে তাকিয়ে
বলেন 'তোকে ভালোবাসি বলে। ভালোবাসা কে সম্মান করি বলে। তুই যে মানুষ
কে ভালোবাসিস, তার রূপ টা কে শুধু নয়, তুই যে সত্যের পাশে আছিস এটাই যে
তোর মা হিসেবে আমার অহংকারের বিষয় রো।'

সীমা মাথা থেকে হাত টা নামিয়ে গালে নামানোর সময় বুঝলেন অনন্যের চোখে
জল। অনন্য এবার জোরে কেঁদে ফেললো। সীমা চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে
ছেলেকে আবার বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

মাঝরাতে ওয়াশরুমে যাবার সময় সীমা দেখলেন শেফালি খাবার টেবিলের সামনে
কি যেন করছে। ঘরে একটা নাইটল্যাম্প জ্বলছে। সীমা বড় আলো টা জ্বালিয়ে দিয়ে
জিজ্ঞাসা করলেন 'কি রে কি করছিস?'

শেফালি একটু হকচকিয়ে গিয়ে চোখে হাত দিয়ে তারপর জলের বোতল নিয়ে
বললো 'জল ফুরিয়ে গেছিল মা, তাই নিতে এসেছিলাম।'

সীমা বললেন 'ঘরে যা, আমি বাথরুম থেকে আসছি। কথা আছে।'

'কি বলবে মা?'

'যা না ঘরে আসছি।'

শেফালি যে কাঁদছিল সেটা ঠিকই চোখে পড়েছে সীমার। এটা তো আর নতুন নয়।
মেয়েটা তো প্রায়ই কাঁদে। দিন গুলো তবু কাজকর্মের মধ্যে কাটে। রাত গুলো যে
সমস্ত খারাপ গুলো নিয়ে গিলে খেতে আসে। সীমা অনেকদিনই ওকে সঙ্গে নিয়ে
শুতেন। তারপর ধীরে ধীরে অভ্যন্তর হয়ে যায় শেফালি। সময় সব কিছু কে হালকা
করে, কিন্তু কিছু স্মৃতি যে সত্যিই তীব্র হয়ে সময় সময় চোখ কান সমস্ত মনের
মধ্যে বেদনা হয়ে বেজে ওঠে। কান দুটো চেপে ধরে শুনবো না বললেও রেহাই
পাওয়া যায় না তার থেকে।

সীমা শেফালির ঘরে গিয়ে দেখলেন ও বিছানায় বসে আছে। সীমা ঘরে ঢুকতেই
শেফালি বললো 'কি গো মা?'

সীমা বিছানায় বসে জিজ্ঞাসা করলেন 'কাঁদছিলি কেন?'

শেফালি চুপ করে মাথা নীচু করে বসে রইলো।'

সীমা তাকে বুকে টেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেফালি হাউ হাউ করে কেঁদে
উঠলো।'

সীমা তাকে বললেন 'আর কাঁদিস না রো ভুলে যা ওইসব দিন। তোর ভাইয়ের বিয়ে সামনে। তুই মন খারাপ করে থাকলে চলবে?'

শেফালি কাঁদতে কাঁদতেই বললো 'তুমি বিশ্বাস করো মা, ভাইয়ের ঘর সংসার হচ্ছে বলে আমার কষ্ট হচ্ছে না মা, আমায় ভুল বুঝো না যেন।'

সীমা শেফালির চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন 'তোর মনে হয় আমি এমন ভাবতে পারি?'

'না মা, তুমি না থাকলে আমি কি করতাম! নিজের মা বাবা তো বেচে দিল আমাকে।'

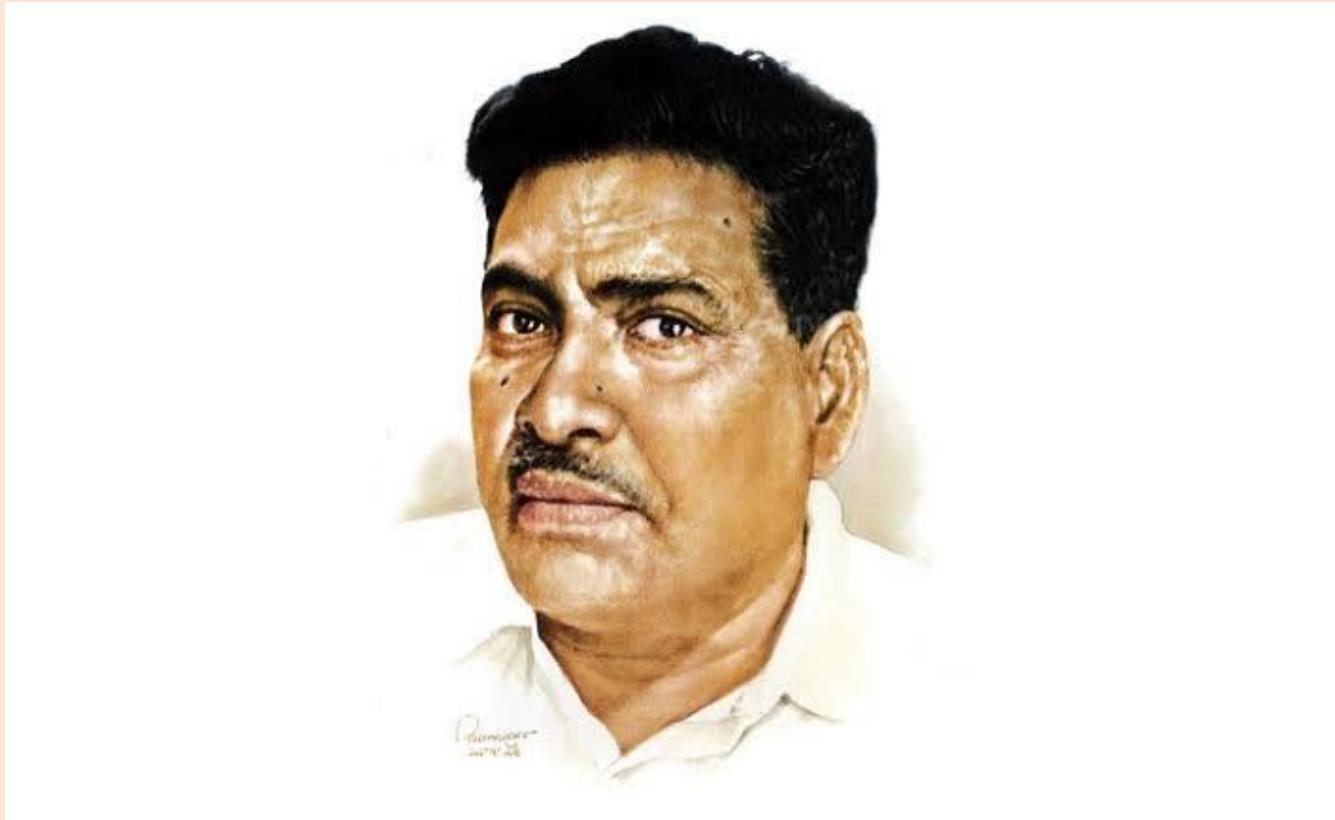
তারপর আবার হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে হেঁচকি তুলে কাশতে কাশতে কথা বলতে লাগলো। মনের কোণে জমাট বাঁধা অঙ্ককার গুলো যেন কথার মাধ্যমে গলে পড়তে চাইছে।

'আমার গোটা গা টা গুলিয়ে ওঠে মা, অত গুলো লোক আমাকে কামড়ে কামড়ে শেষ করে দিয়েছে। তাতেও শান্তি হলো না। পাচার করে দিচ্ছিল। পুলিশের সাহায্য নিয়ে তোমরা যদি না আসতে!'

সীমা বললেন 'শরীরের ময়লা সাবান মাখলে উঠে যায়, কিন্তু অন্যের পাপের ময়লা নিজে মনে মেখে রাখলে কি করে চলবে? পাপী ওরা, তুই নোংরাও তুই নোস। আর কতবার বলবো বল তো?

শেফালিকে আবার বুকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন সীমা। কষ্ট উদগীরণের পরে শেফালি তখন কিছুটা শান্ত হয়।

(সমাপ্ত)



বিভূতিভূষণের ভূতদর্শন

মৃত স্ত্রীর আগ্নার সঙ্গে কথা হত প্ল্যানচেটেশন করেছিলেন প্রেতচর্চা। মৃত্যুর আগে
বিভূতিভূষণের সে এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা!

“গৌরীকে দেখাবেন? আমার গৌরী! একটি বার শুধু দেখা করিয়ে দিন!”

প্রথম স্ত্রী গৌরীর মৃত্যুর পর শোকে ভেঙে পড়ে বিভূতিভূষণ এমন আকৃতিই
করেছেন দিনের পর দিন!

স্তৰিৰ মৃত্যুৰ কিছু দিন পৱেন মণিও মাৰা যান। ব্যারাকপুৱেৱ বাড়িতে পৱে পৱে দুটি
আঘাতে পাগল হয়ে পাওয়াৰ দশা হয় বিভূতিৱ। কলেজেৱ বন্ধুৱা একৱকম জোৱ
কৱে তাঁকে কলকাতা নিয়ে আসে।

একদিন টালিগঞ্জেৱ দিকে একলা ঘুৱতে ঘুৱতে তাঁৰ দেখা হয় এক সন্ধ্যাসীৰ সঙ্গে।
তিনিই বিভূতিকে অশৱীৱী আত্মাৰ বিচৱণ সম্পর্কে ব্ৰহ্মসূত্ৰেৱ কথা বলেন। বিভূতি
অবাক হয়ে শোনেন, বৃহদাৱণ্যকে জনকসভায় মহৰ্ষি আত্মা-তত্ত্বেৱ কী ব্যাখ্যা
দিয়েছিলেন।

সেই শুৱু।

সারা জীৱন বিভূতিভূষণ বিশ্বাস কৱে এসেছেন আত্মা-চৰ্চায়। আত্মাকে ডাকলে
তাকে পাওয়া যায়। শুধু ডাকার মতো ডাকতে জানা চাই।

মৃত গৌৱীকে দেখতে চেয়ে সন্ধ্যাসীৰ কাছেই শিখেছিলেন ‘মণ্ডল’। অৰ্থাৎ
প্ল্যানচেটে আত্মাকে ডাকা।

যেখানেই গিয়েছেন, আমৃত্যু সেই সাধনা কৱেছেন। দৱজা-জানলা বন্ধ কৱে, ধূপ-
ধুনো জ্বালিয়ে ডেকেছেন গৌৱীকে। কথা বলেছেন একা একা গভীৱ নিশীথে। কানায়
প্ৰিয়তমাৱ শোকে আকুল হয়েছেন।

সন্ধ্যাসীৰ কাছ থেকে আত্মা-আবাহনেৱ কৌশলটি রপ্ত কৱাৱ পৱে কয়েক দিন তুমুল
মেতেছিলেন তিনি। বিস্তৃত এই পৱলোকচৰ্চাৰ স্বাদ পেয়ে, নাম লিখিয়েছিলেন
কলেজ স্কোয়াডেৱ থিওসফিক্যাল সোসাইটিতেও। এক সময় যাব সভাপতি ছিলেন

প্যারীচাঁদ মিত্র। তিনিও স্ত্রীর মৃত্যুর পর মেতে উঠেছিলেন আত্মার সঙ্গে নিঃস্ত
সংলাপে।

সোসাইটির সদস্য হয়ে বিভূতি যেন নতুন দিগন্তের সন্ধান পেলেন। জানা হল
চক্রাধিবেশন। ধীরে ধীরে জানলেন, তাঁর কল্পলোকের দেবতা রবিঠাকুরও প্ল্যানচেট
করেছেন। এও জানলেন, বিদ্যাসাগর যে দিন চলে যান, বৃন্দাবনের আকাশে তাঁর
আত্মা দেখেছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী! শুনলেন, স্বামী বিবেকানন্দকে কোনও
আত্মা এসে তাঁর পিণ্ড দানের অনুরোধ করেন।

বিভূতির সেই সময়ের প্রিয় বন্ধু নীরদ সি চৌধুরী লিখেছেন, বিভূতিভূষণের
পরলোকচর্চার মতিগতি।

নীরদ মনে করতেন, বিভূতির পরলোকে বিশ্বাস ঠিক ‘বিশ্বাস’ নয়, কুসংস্কার হয়ে
উঠেছিল।

নিছক তাই কি?

পরলোক নিয়ে এত অগাধ পড়াশোনার পর সেও কি সন্তুষ্ট! কেন না, বিভূতি তো
ঘোর বাস্তববাদী ছিলেন।

চর্চা এখানেই থেমে রাখল না।

জাঙ্গিপাড়া দ্বারকানাথ হাইকুলে যখন পড়াতে গেলেন, তাঁকে ঘিরে কয়েকজন ঠিক
জুটে গেল পরলোকচর্চায়।

অন্ধকার ঘরে টেবিল পেতে তাঁরা মোমবাতি জ্বালিয়ে বসলেনও।

ବିଭୂତି ଏକ ଏକଦିନ ଡେକେ ଆନତେନ ପରଲୋକ ଥେକେ ପ୍ରିୟଦେର। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରେତଚର୍ଚାହିଁ କାଳ ହଲ ତାଁର।

ଜାଙ୍ଗିପାଡ଼ାର ହାଓୟାୟ ନାନା କଥା ରଟଲ।

ଶ୍ଵଲବାଡ଼ିତେ ମାସ୍ଟାର ପ୍ରେତ ନାମାୟ, କଥାଟା ଅଭିଭାବକରା ଭାଲଭାବେ ନିଲେନ ନା। ଛାତ୍ର କମତେ ଲାଗଲ। ବିପଦ ବୁଝେ, ଶ୍ଵଲ କମିଟି ବିଭୂତିକେ ଶ୍ଵଲ ଥେକେ ତାଡ଼ିଯେ ଦିଲ। ତବୁ ସରେ ଆସେନନି ବିଭୂତି ପ୍ରେତଚର୍ଚା ଥେକେ।

ହରିନାଭି-ରାଜପୁରେ ସଖନ ଅୟାଂଲୋ ସ୍ୟାନସକ୍ରିଟ ଇନସିଟିଟ୍ଟୁଶନେ ପଡ଼ାତେ ଗେଲେନ, ସେଖାନେଓ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷ୍ଟର ଜାନାଜାନି ହୟ ତାଁର ପରଲୋକଚର୍ଚାର ଥବର।

କ୍ରମଶ ପରଲୋକ ନିଯେ ତାଁର ବିଶ୍ୱାସଓ ତୁକେ ପଡ଼େ ଲେଖା ଗଲେ, ଉପନ୍ୟାସେ। କଥନେ ସଖନେ ତା ନିଯେ ସଚେତନ ହୟେ ଛେଟେଓ ଫେଲେଛେନ ମୂଳ ଲେଖା ଥେକେ ସେଇ ଆଧି-ଭୌତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତବୁ ଶେଷ ରକ୍ଷେ ହୟନି!

ବିଭୂତିଭୂଷଣେର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣୀଦେବୀର ବାବା ଘୋଡ଼ଶୀକାନ୍ତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଛିଲେନ। ଦୀକ୍ଷାଓ ନିଯେଛିଲେନ ଏକ ବୈରବୀର କାଛେ। ତାଁକେ ନିଯେଇ ବିଭୂତି ‘ତାରାନାଥ ତାନ୍ତ୍ରିକ’ ଲିଖେଛିଲେନ।

ଜାମାଇୟେର ପରଲୋକ ନିଯେ ଅତି ଉଠ୍ମାହେ ଅବାକଇ ହତେନ ଘୋଡ଼ଶୀକାନ୍ତ। ଜୀବନେର ଶେଷ ପର୍ବେ ସଖନ ବ୍ୟାରାକପୁରେ ରଯେଛେନ ଦେଖା ମିଲଲ ଏକ ବୈରବୀର। ବିଭୂତି ମେତେଓ ଉଠେଛିଲେନ ତାଁର ସଙ୍ଗେ।

তৈরবী শবসাধনা করতে এসেছে জেনে, বিভূতিও নিত্য যাতায়াত বাড়ায়। রেগে যেতেন কল্যাণী। তবু কী এক মায়ায় নাছোড় বিভূতিকে আগলে রাখতে পারতেন না! রাতভর সাধনায় মেতে থাকতেন স্ত্রী-সংসার ভুলে।

তাঁর দিনলিপির পাতায় পাতায় পরলোক নিয়ে বিশ্বাসের কথা রয়েছে। তারই সংশ্লেষ ‘দেবযান’ উপন্যাস।

মৃত্যুর পর আত্মার উপস্থিতি নিয়ে বিভূতির বিশ্বাস যেন প্লটের বাঁকে বাঁকে।

মৃত্যুর পর কোথায় থাকে আত্মা? শবের কাছেই কি দাঁড়িয়ে থাকে? কী ভাবে উড়ে যায়? ফিরে আসে কি?

সব উত্তর যেন মিলে যায় যতীন চরিত্রিকে নিয়ে এই লেখায়। তাঁর জীবনীকার কিশলয় ঠাকুর জানিয়েছিলেন, ‘‘যে সময় ‘দেবযান’ প্রকাশ হচ্ছে, তার বহু আগে থেকেই বনগাঁর বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাঢ়ান। তিনিও পুত্রশোকে কাতর ছিলেন। দুঃখ ভুলতে প্ল্যানচেটে ছেলের সঙ্গে কথা বলতেন। বীরেশ্বরবাবুর সংগ্রহে ছিল পরলোকচর্চার নানা বই। সে সব বইতে বিভূতি ডুবে থাকতেন। পাতায় পাতায় নিজের নোটও লিখে রাখতেন।’’

বিভূতিভূষণের পরলোকচর্চার বিষয়টি সে সময় লেখকদের অনেকেই খবর রাখতেন। বিভূতির জীবনকথা জানাচ্ছে, প্রমথনাথ বিশীর ছোট ভাই মারা গেলে, শোক-সন্তপ্ত গোটা পরিবার বিভূতির কাছে এসেছিল। বিভূতি শ্লেষে দাগ টেনে মৃত ব্যক্তির আত্মার গতিপথ দেখিয়েছিলেন। তাঁদের এও বুঝিয়েছিলেন, আত্মার জন্য শোক করতে নেই! তাতে আত্মার দহন বাড়ে!

দিন যত ফুরিয়ে এসেছে, পরলোকে বিশ্বাস যেন তত বেড়েছে বিভূতির।

শেষবেলায় ছেলে তারাদাস অসুস্থ হয়ে পড়লে, একদিন স্নান সেরে ফিরে নাকি
দেখেছিলেন, ছেলের মাথার কাছে বসে রয়েছে কেউ। বিভূতি বুকে জড়িয়ে নেন
তারাদাসকে। বলেন, ‘‘ওকে দেব না’’

সেই বিদেহী আগস্তক তখন নাকি বলে ওঠে, ‘‘তোমার ছেলের আয়ু নেই। ওকে
যেতে দাও আমার সঙ্গে।’’

বিভূতি সন্তানকে আঁকড়ে বলেন, ‘‘আমার আয়ু দিচ্ছি। তুমি চলে যাও।’’

শেষবার যখন ঘাটশিলা গেলেন, এক সংবর্ধনা সভায় বক্তৃব্য রাখতে গিয়ে নিজের
মৃত্যুর ইঙ্গিত দিলেন যেন!

মনে করতেন, মানুষের সংবর্ধনা মানেই সময় ফুরিয়ে এসেছে। তার আগেই ‘শেষ
লেখা’ গল্পে সেই দেববান-এর সুর।

পরলোকে বিশ্বাসের শিকড় ক্রমশ এত গভীরে গাঁথা পড়েছিল, সর্বক্ষণ মরণের কথা
ভেবে গিয়েছেন শেষের দিনগুলোয়।

বিভূতিভূষণের ভাই নুটুর স্ত্রী যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘উপল ব্যথিত গতি’-তে
বিভূতির শেষ সময়ের একটি বিশেষ ঘটনার কথা মেলে।

যমুনা লিখেছেন, ঘাটশিলায় মৃত্যুর কয়েক দিন আগে ফুলডুংরি ঘূরতে গেলেন।
সঙ্গে অনেকেই। দল থেকে আলাদা হয়ে একটি জায়গায় নাকি দেখেন ছেঁড়া
কাপড়ের টুকরো ছড়িয়ে। খান কয়েক পাথর সাজানো। একটি শববাহী খাট ওল্টানো।

আর্দ্ধ

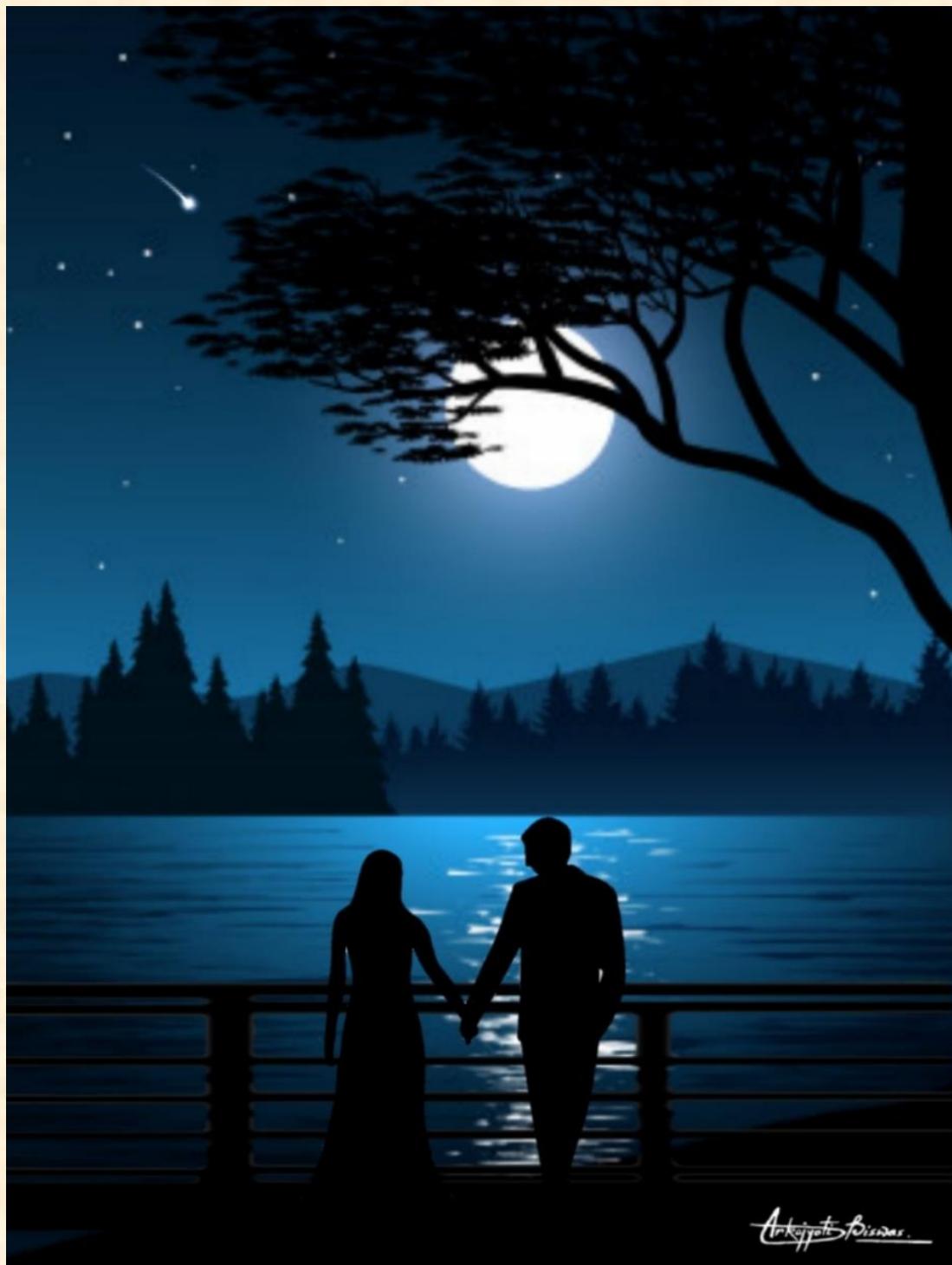
আর একটি খাটিয়ায় মৃতদেহ ঢাকা দেওয়া। বনের মধ্যে, বিভূতিভূষণ গিয়ে টান
মেরে ঢাকা সরিয়ে ফেলেন!

তার পরেই তাঁর আর্ত চিৎকার!

এ কার শরীর!

ধড়ের উপর যে মুখটি, সেটি অবিকল তাঁর!

(সমাপ্ত)



Arkojyoti Biswas

তারায় তারায় রঁটিয়ে দেবো

প্রেমাস্পদ ভরদ্বাজ

"ঢ গো নিরূপমা করিও ক্ষমা

তোমাকে আমার ঘরণী করিতে
আমার মনের দোসর করিতে
পারিলাম না.....।"

"আহা!! ন্যাকা!! তা বিয়ে যখন করবিই না তাহলে ঠ্যাং মুড়ে ঢং মেরে কলেজ
ফেস্টে অতঙ্গলো ছেলেমেয়ের সামনে প্রোপোজ করতে কে বলেছিল শুনি...তোর
বাবা?" তনয়া খিঁচিয়ে ওঠে।

শুভ-র দু-হাত ভর্তি বড় বড় দুটো ফ্রেঞ্চফ্রাই বাকেট , দুটো কোকের বোতল
কয়েক সেকেন্ড ঠকঠক করে কেঁপে আবার চুপ দিল।

"আরে বাবা রেগে যাচ্ছিস কেন.. দ্যাখ তোর জন্য কি এনেছি!! এগুলোর সদগতি
করতে করতে না হয় ঝগড়াটা চলুক।"

গলত বিকেলের রেশ কাটতে না কাটতেই ঝুপ করে নেমেছে ধূসর সন্ধ্যা। ঘরে
ফেরা পাথিদের ঝাঁক মিইয়ে যাওয়া নীলে নানারকম নকশা কেটে অঙ্গায়ী নীড়ে
ফিরে যাচ্ছে। কালোপিচে মোড়া রাস্তার দুপাশে বহুযুগ ধরে একা একা দাঁড়িয়ে থাকা
ত্রিফলা স্ট্রিটলাইটগুলো একে একে জেগে উঠছে দিবাস্পন্দ ভেঙে। দু-একটা তারা
হঠাতে আকাশের গালের তিল হয়ে জেগে উঠল।

গলত বিকেলের রেশ কাটতে না কাটতেই ঝুপ করে নেমেছে ধূসর সন্ধে। ঘরে ফেরা পাখিদের ঝাঁক মিহিয়ে যাওয়া নীলে নানারকম নকশা কেটে অস্থায়ী নীড়ে ফিরে যাচ্ছে। কালোপিচে মোড়া রাস্তার দুপাশে বহুবৃগ্র ধরে একা একা দাঁড়িয়ে থাকা ত্রিফলা স্ট্রিটলাইটগুলো একে একে জেগে উঠছে দিবাস্পন্দ ভেঙে। দু-একটা তারা হঠাতে আকাশের গালের তিল হয়ে জেগে উঠল। দু একটা খসেও পড়ল কি? কে জানে?

ডিভাইডারটার ওপরেই পা ছড়িয়ে বসে পড়ল শুভ। হাতের জিনিসগুলো সামনে নামিয়ে রেখে হাতগুলো জোরে বারকয়েক ঝেড়ে নিল। এতক্ষণ ওগুলোকে একনাগাড়ে ধরে থাকতে থাকতে ঝিন ধরে গেছে। সামনে একটা শতদল আঁকা কমলা কাগজ পড়ে ছিল সেটা দিয়ে জায়গাটাকে ভালো করে পরিষ্কার করে একটা আনন্দবাজার পত্রিকা পেতে তনয়ার দিকে তাকিয়ে বললো-

" এই নে... জলদি বসে পড়.... নাহলে উড়ে যাবে।"

তনয়া এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবছিল, কিন্তু এবার শুভর দিকে কটমট করে তাকাল।

" উড়ে যাক্ গো। ওগুলো তুই-ই গেল। আমার গলা দিয়ে ওই একধোঁয়ে খাবার রোজ রোজ নামবে না।"

শুভ প্রমাদ গুনল। তনয়ার মেজাজ সাবজেক্ট হলে ও এতদিনে জাস্ট তুড়ি মেরে তাতে পি এইচ ডি করে ফেলত। ওর এই রগরগে গরম মাথার এফেক্টিভনেস্টা ও দিনদিন আরো বেশী করে টের পাচ্ছে। মাঝে মাঝে মনে হয় "তালাক, তালাক, তালাক বলে দুটো ঠ্যাং বগলে গুঁজে দৌড়ে পালাই কিন্তু তারও উপায় নেই...ছাই"

" দ্যাখ পকেটে কয়েকটা টাকা ছিল, তা দিয়ে তোকে আর কি খাওয়াব বল ? ঘরে বানানো ভাত রঞ্চি যদি তোর না পোষায়... তাতে আমার কী দোষ বলতে পারিস?"

" তাই বলে রোজ রোজ এই ফ্রেঞ্চ ফ্রাই !! তুই না বলেছিলি বিয়ের পর আমাকে রোজ বিরিয়ানী খাওয়াবি!!

মরণদশা!! ক্যায়া হ্যাতের উয়ো ওয়াদা?"

তনয়া ঠোঁট ফুলিয়ে বলে। শুভ ওর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। মনে মনে বলে- "রেগে গেলে ওকে কি যে সুন্দর লাগে! আরক্তু ঠোঁট আর ওই অপলক চোখে লেগে থাকা ছদ্ম অভিমান, মনে হয় প্রানভরে চটকা পটকা করিব!"

কলেজের তিন তিনটে বছর তো এভাবেই সেমি বাগড়া আর মানভঞ্জন পর্ব সেরে কাটিয়ে দিয়েছে ওরা। প্রথম প্রথম মুখ না দেখাদেখির টাইম পিরিয়ড বাড়লেও পরে কম্পালসারি সাবজেক্ট হয়ে যাওয়াতে অন্য কোন উপায় ছিল না ওদের কাছে। এ

যେନ ଓଦେର ଭାଲବାସାର ସେଞ୍ଚ କୋଯାରେଣ୍ଟିନ। ଯେଖାନେଇ ଯାକ ନା କେନ, ଫେରାର ଜାୟଗାଟା ଯେ ଦୁଜନେରଟି ଏକ।

" ଏହିଜନ୍ୟଇ ତୋ ତୋକେ କତବାର କରେ ବଲେଛିଲାମ... ଓରେ ସିଜିଦାର ୨୨ ଶେ ଶ୍ରାବଣ ଟା ଦ୍ୟାଖ... ଡାଳ ଭାତ ଆର ବିରିଯାନୀର ତଫାଂ ଟା..."

ଶୁଭର କଥାଟା ମାଝଖାନେ କେଟେ ଦିଲ ତନୟା।

"ହଁ ରେ... ବାବା ମା କେ ଲାସ୍ଟ କବେ ଦେଖେଛିଲାମ ତୋର ମନେ ଆଛେ? ଆଜ ହଠାଂ କେନ ଜାନିନା ଓଦେର କଥା ଖୁବ ମନେ ପଡ଼ିଛେ..... ଜାନିସ? ଓରା ଏଖନ କୀ କରଛେ କୋଥାଯା ଆଛେ କେ ଜାନେ?"

ଶୁଭ କିଛିକଣ ଚୁପ କରେ ଥାକେ। ଦେଖିଲ ତନୟା ଓଭାରବ୍ରିଜେଟାର ଧାର ଘେଁସେ ଦାଁଡିଯେଛେ। ରାସ୍ତାର ଏ ଦିକଟା ବେଶ ନିର୍ବାଦ୍ମା ମାଝେ ମଧ୍ୟେ ଦୁ ଏକଟା ବାଟିକ ପେରିଯେ ଯାଚେ ଆଲୋ କରେ ଆବାର ସବ ଅନ୍ଧକାର ଏସେ ଗିଲେ ନିଚ୍ଛେ ଆଗେର ମତୋ। ସ୍ଟ୍ରୀଟଲାଇଟେର ଆଲୋଙ୍ଗଲୋ ଏଖନେ ଠିକଠାକ ରାସ୍ତା ଛୁଚେ ନା।

ଆକାଶେର ଦିକେ ମୁଖ ତୁଲେ ତନୟା କୀ ଯେନ ଦେଖିଛେ। ଓର ଚୋଖଦୁଟୋ ଆଜ ବେଶ ଅନ୍ୟରକମ। ଯେନ ଦୁଟୋ ତାରାର ଆଲୋ ହାରିଯେ ଗେଛେ ନିଗୃତ କାଲୋଯ ହାରାନୋ ଆପନଙ୍ଗନ ଖୁଁଜିତେ ଗିଯେ।

ମେଘେଦେର ମନ ବୋକା ନୟ ରେ ନୟ ସୋଜା।

আদৌ কী তাই? না আমাদের পুরুষদের মোটর রিসেপ্টরগুলো এই এক জায়গায় এসে কেলিয়ে যায় চিরকাল। মেয়েরা শুধুই অনুভূতি, শেষ বিকেলের ছাদে গায়ে বিদ্ব শ্রাবণের জোলো ঠান্ডা বাতাস, যার বিজ্ঞান খুঁজতে গেলে বারবার বোকা হতে হয়।

শুভ খাবারগুলো রেখে উঠে পড়ল। এগিয়ে গেল তনয়ার দিকে। ওর গায়ে হাত রাখতেই ও একঝটকায় ফিরে জড়িয়ে ধরলো শুভকে। শুভর পাঞ্জাবির বুকটা ভিজে গেল। মনে হলো হাজার বছরের কষ্ট জলের দাগ হয়ে নেমে আসছে। শুভ চট্ট করে কাঁদে না, তবু ওর চোখ দুটোতেও কী আর্দ্ধতা বাড়ল? আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরল তনয়াকে। পাশ দিয়ে একটা লাল ভ্যান তাড়াহুড়োয় পেরিয়ে গেল। দুটো অঙ্গ এখন নিজেদের সঠিক আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে।

"তোর চোখে জল একদম মানায় না, তোকে বিয়ে করে সারাজীবন কাঁদার কথা তো আমার ছিল। তাহলে আজ হঠাৎ তুই সেটা ভুলে গেলি কী করে?"

"ছাড় আমাকে!!" একটানে নিজেকে সরিয়ে নিল তনয়া।

" এইসব ন্যাকামি করেই তুই আমাকে পটিয়েছিস। ওই বেবিফেস আর মায়ামাখা চোখদুটো দেখে আমি তখন ধোকা খেয়ে গেছিলাম। সেদিন যদি জানতাম তোর সঙ্গে এভাবে ফেঁসে যাব আর তোর ওই ছ্যাড়ছ্যাড়ে সাইকেল একদিন আমাদের বাজেভাবে কেস খাওয়াবে তাহলে আমি কোনোও ওদিন...."

এবার শুভ রীতিমতো ভড়কে গেল। তড়পিয়ে পাঞ্জাবির হাতা গোটাতে গোটাতে কাঁধটা বারকয়েক ঝাঁকিয়ে ওর সামনে এল।

" কি আমি ন্যাকা? মানছি আমার গ্যাঁট টিলে তবু একটা প্রেস্টিজ তো আছে নাকি?
আর যেটাকে তুই সাইকেল বলছিস সেটা হিরো হন্ডার বাইক...আমার বাবাও
চালিয়েছে!! আর তার পেছনের সিটে বসেই তুমি আমার কানে কাতুকুতু
দিতে....সে কথা কি তোমার মনে আছে প্রিয়ে...না দিবিয় ভুলে মেরে দিয়েছ?"

" নিজের কিছু ক্যালি আছে তোর? সেই কবে থেকে বলতাম এবার একটা চাকরি
জোটা, নাহলে সংসারটা কী করে চলবে? না উনি লেখক হবেন!! নে....এবার
আমার ভূত হয়ে যাওয়ার গল্প লেখ বসে বসে....।"

তনয়া চিরাচরিত আগ্নেয়জ্বালা চাউনি দিয়ে শুভকে প্রায় ভস্ত্র করে দ্যায় দ্যায়। এ
দৃষ্টিকে ডচ ও করা যায় না। যেন ডার্কসাইডের ওমেগা বিম, তাড়িয়ে তাড়িয়ে
কালঘাম ছুটিয়ে তবেই বধ করবে। হা ভগবান...তুমি ঝুলে পড়ো...আর আমাকেও
পাশে ঝুলিয়ে নাও !!

" আরে ভাই এ রাজে চাকরি কোথায়? তেবেছিলাম তোকে বিয়েটা করেই
রেশনের দোকানে লাইন দেব। তাছাড়া রোগঅসুখ হলে স্বাস্থ্যসাথী তো
আছেই....হে হে হে হে....."

" অপদার্থ!!" তনয়া স্বগতোক্তি করে।

" আরে চট্টিস কেন? এখন তো আর চাকরিবাকরির বালাই নেই। হাওয়া খাও আর
মালা ঘোরাও!"

তনয়া এতক্ষণ ঠোঁটে ঠোঁট চিপে ওকে সহ্য করছিল। এবার রাস্তার ধার বরাবর হাঁটা শুরু করল। শুভও চললো ওর পেছন পেছন। খপ্ক করে হাতটা ধরে দিল এক টান। দুটো হাত দিয়ে এবার খুউব কাছে টেনে নিল। ওর মুখ আর তনয়ার মুখ এখন খুব কাছে।

"ছাড় ছাড় আমাকে!!" তনয়া নিজেকে ছাড়াতে চাইল। "এই একদেঁয়ে জীবন থেকে কবে মুক্তি পাব কে জানে?"

"ছেড়ে দেব বলে তো ধরিনি, সেদিনও একা ছাড়িনি আজকেও ছেড়ে যাব না... আমাদের ভাগ্য আমাদের এক করে দিয়েছে আর আমরা এক হয়ে গেছি তারও আগে... বেস্টফ্রেন্ড কোনদিন ছেড়ে যায় না... আর যেতে চাইলেই যাওয়া যায় না। সব সম্পর্কে ফেরার পথ থাকে না.... তনু।"

তনুর দুচোখে এখন এক অঙ্গুত মায়া খেলা করছে। এ মায়া রাতের তারাঞ্জলোকেও যেন একে একে নিভিয়ে দিচ্ছে আর ছায়াপথ ধরে নামাচ্ছে এক অঙ্গুত আলোকবৃষ্টি, যার শব্দ শুনতে পাচ্ছে হাজার হাজার আলোকবর্ষ দূরের সভ্যতার সভ্যরা।

শুভ চোখ বন্ধ করল। তনয়ার গায়ের মিষ্টি গন্ধে ঘোর লাগছে। অবকাশে লেখা কবিতা হয়ে ঝরে পড়ছে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র আর ঝুঁতুরারা। চারপাশে বাজে শব্দগুলো নিজেদেরকে গুটিয়ে নিচ্ছে ধীরে ধীরে।

তনয়ার নিশ্চাসগুলো গোনা যাচ্ছে এবার। তার অভিমানসিক্ত ঠোঁটদুটো চেপে ধরল শুভর ঠোঁট। সমস্ত স্বত্ত্বায় একসঙ্গে যেন কোটি টাকার বাজি ফাটল আর তার শব্দ মিলিয়ে গেল কোন এক নতুন কৃষ্ণগহুরের বুকে।

শুভ আর তনয়া এটাই তো চেয়েছিল। মানুষের অনুভূতি প্রথম প্রথম চাওয়ার সঙ্গ দিলেও শেষে বন্ধুবদল করে। কিন্তু এক্ষেত্রে ওরা ভীষণ লাকি।

আনন্দবাজার পত্রিকাটা এবার একটা জোরে হাওয়া দিতেই উড়ে গিয়ে রাস্তার একপাশে গিয়ে পড়ল। সেখানে তিন নম্বর পাতায় ঝকঝকে হরফে এক আটিকেলে লেখা -

" বেশ কিছুদিন যাবৎ সতীঘাট ওভারব্রিজের পথ রাতেরবেলা বন্ধ করা হয়েছে। কয়েকজন ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পথে ডিভাইডারের ওপর দুই ছায়ামূর্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেসেই ঘটনা ঘিরেই মানুষের মনে ভয় দানা বাঁধতে শুরু করেছে। কেউ কেউ মনে করছে এক বছর আগের এক বাইক অ্যাঞ্জিডেন্টের সঙ্গে এই ঘটনার কোন সম্পর্ক রয়েছে কারণ সেখানেই ডিভাইডারে ধাক্কা খেয়ে বাইকআরোহী যুবক ও যুবতীর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ঘটেছিল।"

"এবার ছাড় শুভ...নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।"

"সে কি রে!! মরে ভূত হয়ে যাবার পরেও?" শুভ ঠোঁট সরিয়ে নিয়ে বললো।

"দ্যুৎ..আগে বল....তুই আমাকে ছেড়ে চলে যাবি না তো?" তনয়ার আদুরে গলায়
ঘুম নামে।

"বেঁচে থাকলে হয়তো একবার ভেবে দেখতাম, কিন্তু মরার পর...নো চান্স!!"

"কী? ঠাস করে একটা চড় মেরে দেব কিন্তু....!!" তনয়া অভিমানের সুরে বলল।

"দ্যাখ আজকাল মানুষের কথার দাম না থাকতে পারে, কিন্তু ভূতের কথার তো
একটা দাম আছে নাকি?

আমি...শ্রীমান শুভজিৎ মুখার্জী...কথা দিচ্ছি আমরণ...ধুউড়ুর.....আভূতগ তোর
ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর কোকের বোতলের সাপ্লায়ার হব, আর হ্যাঁ পারলে কোন দোকান
থেকে ঝেড়ে বিরিয়ানীটা আনারও চেষ্টা করব....পাঙ্কা ওয়ালা প্রমিস প্রিয়ে!!"

"আচ্ছা তাহলে আমিও তোর সঙ্গে ফাটিয়ে ঝগড়া করব। বিয়েটিয়ে করতে হবে না
যাহ্...বিয়ে করে যদি পটল তুলতাম, তাহলে হয়তো মরণোত্তর লাইফটা ভীষণ
বোরিং হতো রো।" তনয়া আনন্দে লাফিয়ে ওঠে।

আর্দ্ধ

"আমি আবার কানে নাকে তুলো ঠুসে দেব বলে দিচ্ছি....ধ্যাঃ... এখন সেসবেরও তো উপায় নেই..."

ব্যাস আর কি? মান অভিমানের ফ্রিজারে রাখা সব বরফ এঙ্গেবারে গলে জল! মনে হচ্ছে আজ আবার বৃষ্টি হবে। যেমনটা হয়ে আসছে গত একটা বছর ধরে, প্রতিদিন এই একই জায়গায় যেখানে রোজ দুটো অশরীরী নিজেদের মিল খুঁজে নেয় শহরের এত অমিলের গ্যাঞ্জামে। জ্যান্ত দাদু কাকুরা এসব দেখতে পায় না বলে রক্ষে, নাহলে অপসংস্কৃতির সব ঢ্যালাঙ্গলো এদিকেই তাক করে সারারাত বসে থাকত। যাই হোক.. ভূত হবার এই অ্যাডভান্টেজগুলো তো আছেই...।

রাত বাড়ছে। ঠাণ্ডা একটুকরো বাতাস হয়ে দুজনে দুজনের হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে মিলিয়ে গেল যেদিকে অন্ধকারটা আরেকটু বেশী। কালকে আবার ফিরে আসতে হবে তো?

তোমরা ভাবছ তাহলে ক্রেঞ্চ ফ্রাই আর কোকের বোতলদুটোর কী হলো... তাই তো ? আরে ভূতে কী ওসব খায় নাকি... অ্যাঁ...।

শুভ আর তনয়ার মতো ভূত কাপল আছে বলেই হয়তো ভালোবাসা সুপারম্যানের বুকের ক্যাপিটাল S এর মতো আশা যোগায়। নাহলে মানুষের জবানে তো- " Love is just a verb." পুরো থিয়োরিটাই তো সেক্সুয়ালিটি আর অক্সিটোসিনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

তাই ঠিক করেছি মরেটরে গেলে পরের জন্মে ভূত হব আর একটা ভূত গার্লফ্রেন্ড
জুটিয়ে জমিয়ে প্রেম করব। সেখানে সবটাই তো ইনফিনিট লুপা বারবার লাগাতার।
মানসিক পরিবর্তনের নো ফ্যাঁকড়া।

যাকে গোদাবাংলায় বলে...উ মা গো টুরু লব....।

ছাদে ঘূরতে ঘূরতেই গল্লটা লেখা শেষ করলাম। আমার মাথার ওপরের আকাশের
রক্তাভ থেকে কালচে হবার পালা। ছোটবেলা থেকেই তারায় ভরা কালো চাদরটা
আমায় ভীষণ টানে। ইচ্ছে আছে জীবনের শেষ সময়ে একবুক তারা ভরা আকাশ
সঙ্গে নিয়ে যাই। প্রিয়তমার কোলে যেন চিরশান্তির ঘূম নামে....বারবার।

বহুদূর হতে আবারো একটা চেনা গান কানে আসছে-

" চলে এসো আজ একবার

চলো মরে যাই বারবার...প্রিয়তমা।"

লেকিন বন্ধুগণ জানে সে পেহেলে.....

খোঁচাখাওয়া নিশাচর প্রেমিককে দিল সে নিকলা হ্যাঁ চন্দ আলফাজ-

রাত কেড়েছিল প্রিয় ঘূম আমার

খসেছিল তারা হাজার নক্ষত্রলোকে,

তুমি এসেছিলে তাই স্বপ্নগুলো বাঁচে

কৃষ্ণগহ্বরে আঁকা তোমার দুটো চোখে ॥

(সমাপ্ত)



ক্লাব ঘর

আলিম্পনা দাস

পরলোক নিয়ে মানুষের আগ্রহের কমতি

নেই। মৃত্যুর পরের জীবন কী রকম এই নিয়ে
মাতামাতি করার লোকেরও কোনো অভাব
দেখা দেয়নি। শীতের বিকেলে ঝমঝমিয়ে
বৃষ্টি নামলে ক্লাবে বসে ভূতের গপ্পা
করতেও কাঠোর আপত্তি হয় না। বলতে
গেলে শীতকালীন বাদলার মতো বিরক্তিকর
পরিবেশে আধোআলোকময় অঙ্ককার
পুরোনো ক্লাব ঘরে বসে ভূত জিনিসটা বেশ
ভালোই উপভোগ্য বটে।

তেমনই এক দিনে অফিস ছুটির পর ক্লাবে গিয়ে জড়ো হয়েছিলাম আমি ঈশ্বর চন্দ্ৰ মজুমদার , জগদীশ বাবু , ইমনবাবু আৱ অধীৱ বাবুৱ মতো ব্যক্তিৱা। সারাদিনেৱ
একঘেয়ে ঝুটিনেৱ মধ্যে ওই ক্লাবটুকুই যা একটু ভিন্ন স্বাদেৱ রেশ। তাই ক্লাব মিস
নৈব চ নৈব চ। বড় জল মাথায় করে হলেও ক্লাবে টু মারা চাইই চাই।

সেই মতো বিকেল হতেই গুটি গুটি পায়ে ক্লাবে এসে বসেছিলাম প্ৰায় সৰাই। শুধু
অধীৱ বাবু তখনও অনুপস্থিত। অথচ সদস্যদেৱ মধ্যে সেই সবচেয়ে তরুণ এবং
আজড়াবাজ।

নিশ্চিতবাবু একবার বলেছিলেন বটে , “অধীৱটা এখনও এলো না , ব্যাপার কি বলো
দেখি !”

জগদীশ বাবু থামিয়ে দিলেন।

“আৱে মশাই কী আৱ হবে বৃষ্টিটা যা বেড়েছে , আটকে গেছে কোথাও। ও ঠিক
চলে আসবো”

এৱই মধ্যে কাকভেজা হয়ে অধীৱ হাজিৱ। শুধু জলই নয় একটু নজৰ কৱলেই
বোৰা যায় একেবাৱে কাদায় মাখামাখি হয়ে এসেছে।

এসেই গুম হয়ে বসে রইল। বললাম , “কী হে অধীৱ , এমন কাদায় মাখামাখি হলে
কী কৱে ?”

মুখটা বাংলাৱ পাঁচ কৱে সে বললে , “আৱ বলো কেন আজকালকাৱ ছেলেছোকৱা
গুলো যা গাড়ি চালায় , রাস্তা দিয়ে কি শান্তিতে চলাৱ জো আছে !”

হেসে বললো , “আহা হলো টা কী বলো না ?”

“হবে আবার কী , উচ্ছন্নে গেছে সব। আজ আবার অফিস থেকে বেরোতে দেরী হয়ে গেল। আর হাওড়া স্টেশন জানো তো যা ভীড়। স্টেশন পৌঁছে শুনলাম লাইনে জল জমে আজ সব ট্রেন লেট। তখনই শুনলাম বলছে ২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে শেওড়াফুলি লোকাল ছাড়ছে। সিগন্যাল গ্রীন হয়ে গেছে। আমি তো দেখেই দৌড়লাম। পড়ি কি মরি আজকের দিনে এই ট্রেন ছাড়লে চলবে না। বৃষ্টির ছাঁটে স্টেশন ভিজে কাদা হয়ে গেছে। প্রায় ট্রেনটা ধরে ফেলেছি ঠিক তক্ষুনি গেল পা স্লিপ করে। লোকের হৈ হৈ কানে গেল। ”

“বলো কি হে !”

“তবে আর বলছি কী , তবে আমিও অধীর মিত্র। দেখি ট্রেনটা যেন একটু স্লো হলো। আমিও অমনি লাফিয়ে উঠে ট্রেনে চেপে ভীড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ”

“বটে। তা অমন করে যে পড়লে বেশি চোট লাগেনি তো। দেখো বাবা , বুড়ো হাড়। ভাঙলে আর জুড়বে না। ”

“ না গো তেমন কিছু না। এই মাথার কাছটায় একটু ফুলেছে এই যা। ”

তাকিয়ে দেখি মাথাটায় বেশ জোরেই লেগেছে। রক্ত জমাট বেঁধে নীল হয়ে আছে। জগদীশ বাবু একটু আধটু কবিরাজি করতেন। ঘাড় নেড়ে বললেন , “না না অধীর। চোট বেশ ভালই দেখছি। ”

ইমনবাবু বললেন , ” একটু ওষুধ দেখুন না , চোটটায় একটু লাগিয়ে দিন কিছু। ”

অধীর মাথা নাড়ল। বললো , " না না দাদা , ওসবের আর দরকার নেই। স্টেশনে
নেমে ক্লাবের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আসছিলাম। তখনই ওই নচ্ছার ছেলে গুলো
একেবারে ঘাড়ের ওপর দিয়ে গাড়ি নিয়ে ধাঁ করে বেরিয়ে গেল। চাকায় পুরো গায়ে
কাদ ছিঁটকে এলো। কানার দল , এমন গাড়ি চালায় যেন রাস্তায় একটা বয়ঙ্ক মানুষ
হাঁটছে তারা দেখতেই পায় না। "

এমনি পাজি ছোঁড়া , আমি চেঁচামেচি করলাম। একবার ঘুরেও দেখলো না , সোজা
গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। "

" যা বলেছো। দেশটার যে কী হবে। "

" হ্যাঁ। আজ আমি উঠি। ঘরে গিয়ে কষে স্নান করে ওষুধ লাগিয়ে নেবো। "

" বেশ বেশ। তাই করো। আমিও আজ উঠি।" বলে ইমনবাবুও উঠলেন। একে
একে সবাই উঠলো। আমিও বাড়ির রাস্তা ধরলাম।

রাতটা ঝড় বৃষ্টিতেই কাটলো। সকালে উঠে খবরের কাগজে চোখ বোলাতে
বোলাতে একটা ছোট্ট খবরে চোখ আটকে গেল। বিশুয়ে অভিভূত হয়ে বসে
রইলাম। বিকেল হতেই কাগজটা হাতে নিয়ে ছুটলাম ক্লাবে।

কালকের মতোই আবহাওয়া। ভূতের অস্তিত্ব নিয়ে ইমনবাবু আর জগদীশ বাবুর
মধ্যে তুমুল তর্ক চলছে। গিয়ে চেয়ারে বসে বললাম , " আজকের খবরটা দেখলে ।

"

ইমনবাবু বললেন " কীসের খবর ? "

কাগজে চোখ রেখে বললাম , " অধীর মারা গেছে। গতকাল বিকেলে। চারটের সময়। "

ইমনবাবু চমকে উঠলেন , " সে কী ! "

জগদীশ বাবু হো হো করে হেসে উঠলেন।

" ইয়ার্কি রাখো ঈশ্বর। অধীর গতকাল সাড়ে পাঁচটায় এই ক্লাবে বসে গল্প করে গেছে। তুমি বলছো কী না অধীর মারা গিয়েছে তাও আবার বিকেল চারটায়। "

আমি চুপচাপ হাতের কাগজটা খুলে জগদীশ বাবুর সামনে দিলাম।

" গতকাল বিকেল চারটায় হাওড়া স্টেশনে মৃত্যু হয়েছে অফিস ফেরত এক যাত্রীর। তাড়াহুড়োয় ট্রেনে চড়তে গিয়ে ট্রেনের নিচে লাইনে পড়ে যান তিনি। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু ঘটে। অফিসের আইডি কার্ড থেকে জানা গেছে মৃতের নাম অধীর কুমার মিত্র , বয়স পঁয়তালিশ। "

সঙ্গে একটা ছবি। অধীরের মুখটা বেশ পরিষ্কার বোৰা যাচ্ছে।

জগদীশ বাবু গন্তীর হয়ে গেলেন। ঘড়ির কাঁটা পাঁচটা পঁচিশ। আমাদের হতবাক করে দিয়ে ক্লাবঘরের বন্ধ দরজা ঠেলে ভেতরে তুকলো অধীর। সেই কালকের কাদা মাখা বেশ। এসে চুপ করে চেয়ার বসে পড়লো।

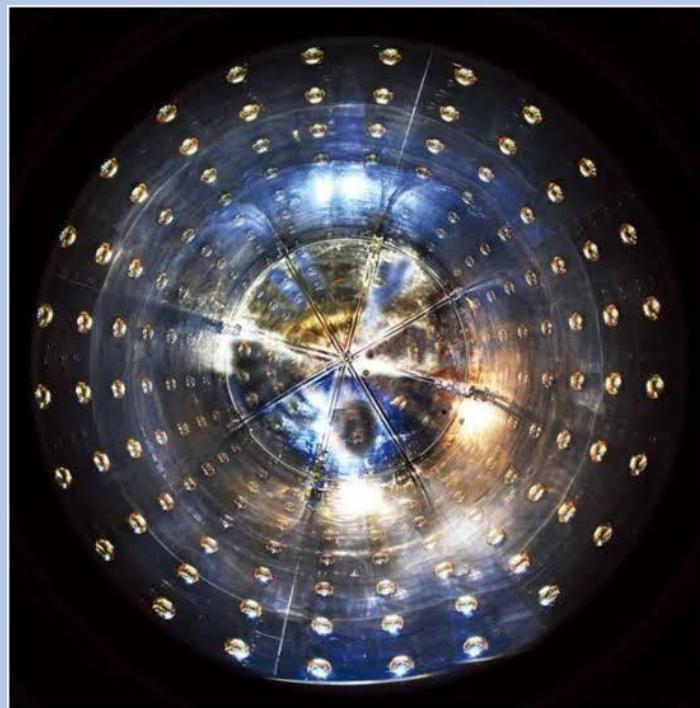
আমরা বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছি তখনই ছাতা মাথায় হস্তদণ্ড হয়ে ভেতরে এলেন অবনী বাবু।

চুকে দরজা বন্ধ করে ছাতাটা রাখতে রাখতে বললেন , " শুনেছো কী হয়েছে। কাল এখান থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফেরার পথে জগদীশ বাবু বাজ পড়ে মারা পড়েছেন । সকালে জানা গেল। আমি গিয়ে দেখি একদম কাঠ হয়ে গেছে .. । " বলতে বলতে থমকে গেলেন। চেয়ারে বসা জগদীশ বাবুর দিকে চেয়ে তার চোখ বড় হয়ে উঠলো।

আমার অবস্থা তখন বর্ণনা করার মতো নয়। কোনোরকমে উঠে বাড়ি পালিয়ে এলাম। আর যাইনি ওই দিকে। কিন্তু আমার বিশ্বাস , আজও যদি যাই তবে সেই পুরনো ভাঙ্গা ক্লাবঘরে আবার দেখা হবে জগদীশ বাবু আর অধীরের সঙ্গে।

(সমাপ্ত)

ভুতুড়ে কণা



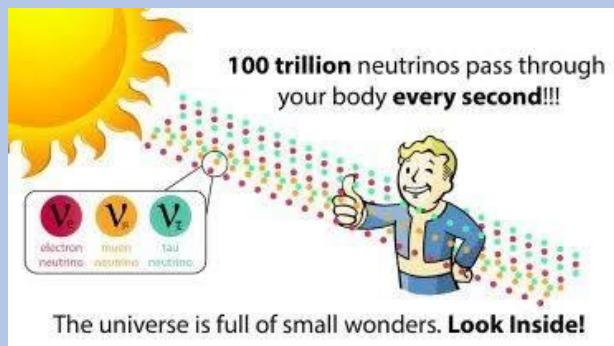
পরিচয়ঃ নিউট্রিনো একটি আধানহীন, অতিক্ষুদ্র ভরযুক্ত অবপারমাণবিক কণা।

গোত্রঃ-

- ১) কণা পদার্থবিদ্যার নিয়ম অনুসারে প্রধান দুইরকম গোত্র হয়ঃ ফার্মিয়ন আর বোসন। নিউট্রিনোকে ‘ফার্মিয়ন’ গোত্রে রাখা হয় (যেই গোত্রে পড়ে ইলেকট্রন, মিউন, প্রোটন, নিউট্রন, কোয়ার্ক ইত্যাদি)। এই গোত্রের কণারা ‘ফার্মি-ডিরাক স্ট্যাটিস্টিকস’ নামক নিয়ম মেনে চলে এবং এদের ‘স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা’ হয় অর্ধসংখ্যার ওনিতক (Half Integers)। নিউট্রিনোর স্পিন $1/2$ ।

২) এছাড়া আরেক নিয়ম অনুসারে একে ‘লেপটন’ গোত্রেও রাখা হয় (এই গোত্রে পড়ে কোয়ার্কদ্বারা গঠিত নয় এমন কণাণ্ডলি যেমন ইলেকট্রন, মিউন, টাও ইত্যাদি)।

কণাদের মধ্যে নিউট্রিনো সবচেয়ে আশ্চর্যরকমের সব ধর্ম দেখায় -



১) (প্রায়) ভরহীনঃ-

নিউট্রিনোকে আপাতভাবে ভরহীন মনে হয়। তবে সূক্ষ্ম পরীক্ষায় দেখা গেছে নিউট্রিনোর অত্যন্ত ক্ষুদ্র ভর আছে। ইলেকট্রনেরও ২.৫ লক্ষ ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ নিউট্রিনোর ভর যেন থেকেও নেই- ভূতের মত!

২) (প্রায়) মিথঙ্গিয়া হীনঃ-

কণারা চারটি মূলগত বলের মাধ্যমে মিথঙ্কিয়া করতে পারে অর্থাৎ অন্য কণাদের
প্রভাবিত করতে পারে বা নিজে প্রভাবিত হতে পারেঃ
মহাকর্ষ, তড়িৎচুম্বকীয়, সবল ও দুর্বল বল।

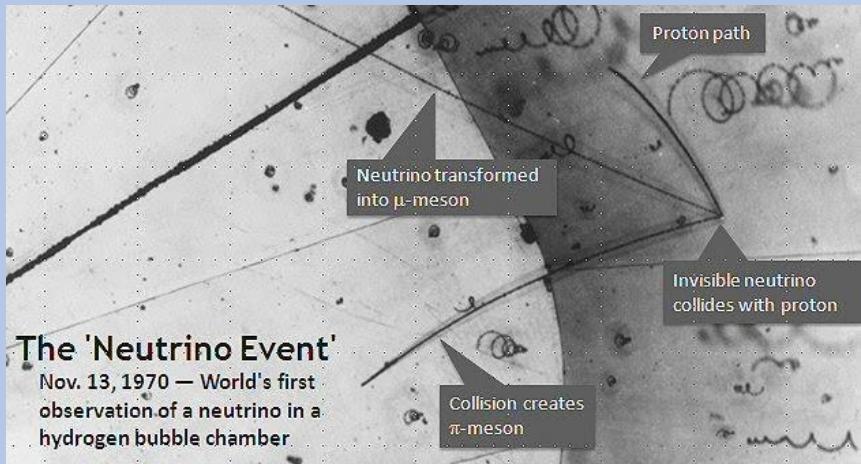
ক) নিউট্রিনো আধানহীন তাই তড়িৎচুম্বকীয় মিথঙ্কিয়া দেখায় না।

খ) কণাজগতে মহাকর্ষ এমনিতেই নগণ্য; নিউট্রিনোর অকল্পনীয় ক্ষুদ্র ভরের কারণে
মহাকর্ষ ধর্তব্যের মধ্যেই পড়েনা।

গ) কোয়ার্কবিহীন বলে সবল বলের ক্রিয়াতেও অংশগ্রহণ করে না।

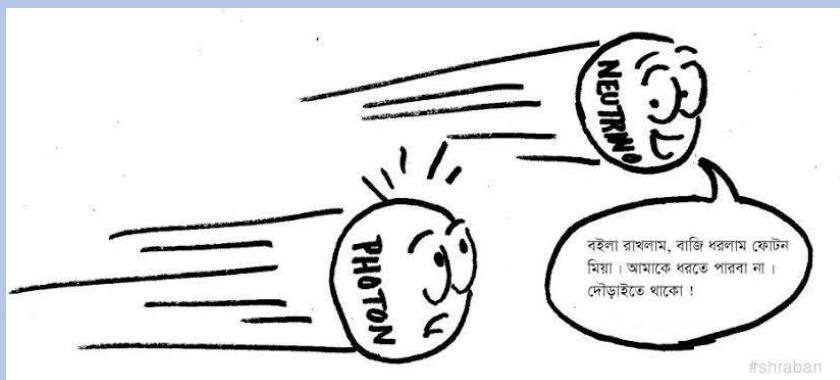
ঘ) বাকী রইল দুর্বল বল। নিউট্রিনো দুর্বল মিথঙ্কিয়ায় অংশ নেয় ঠিকই কিন্তু এরকম
মিথঙ্কিয়া খুব বিরল এবং শনাক্ত করা খুবই কঠিন।

এইসব কারণে মহাবিশ্বে সংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হলেও (সর্বোচ্চ
আলোর কণা ফোটন) নিউট্রিনোর মিথঙ্কিয়া খুব দুর্লভ। প্রায় কোনও প্রভাব নেই
অর্থাৎ যেন থেকেও থাকেনা- ভূতের মত!



৩) শনাক্ত করা প্রচণ্ড শক্তি ও অতিউচ্চ ভেদনক্ষমতাঃ-

কণা পদার্থবিদ্যা গবেষণায় কোনও কণাকে শনাক্ত করা হয় অন্যের ওপর তার মিথস্ক্রিয়া লক্ষ্য করে। নিউট্রিনো মিথস্ক্রিয়া করেই না প্রায়। তাই তাকে ধরতে পারা বা শনাক্ত করা ভীষণ কঠিন। কোনকিছুতেই প্রভাবিত হয়না বলে নিউট্রিনো সমস্ত কিছু ভেদ করে সহজেই চলে যেতে পারে। প্রতি মুহূর্তে বিলিয়ন বিলিয়ন নিউট্রিনো আমাদের দেহ থেকে শুরু করে গোটা পৃথিবীটা, সৌরজগত, গ্যালাক্সি- সবকিছু ভেদ করে চলে যাচ্ছে। ঠিক ভূতের মতই।



৪) রূপবদলঃ-

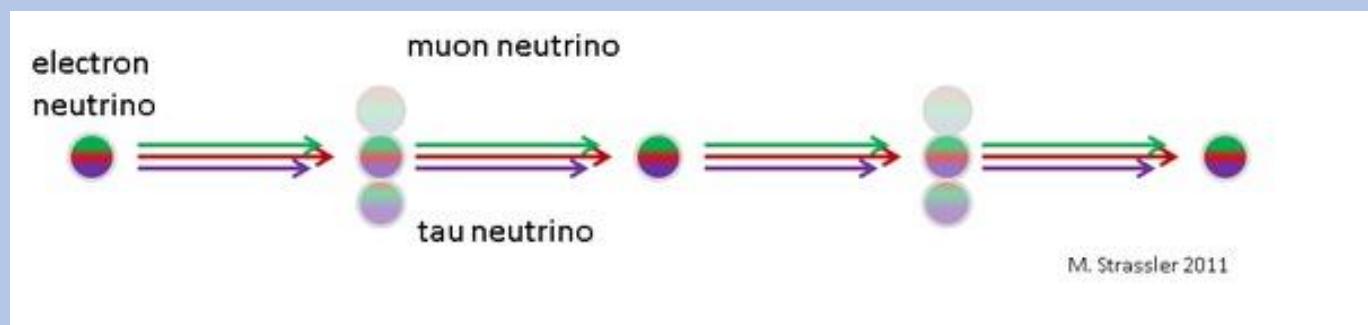
নিউট্রিনো ও রকমের হয়ঃ-

১) ইলেকট্রন নিউট্রিনো

২) মিউন নিউট্রিনো

৩) টাও নিউট্রিনো

দেখা যায় নিউট্রিনো স্থানের মধ্য দিয়ে চলতে চলতেই এই ৩ রূপের মধ্যে একরূপ থেকে আরেকরূপ ধারণ করে। আরও ভালভাবে বললে একরূপ থেকে একাধিক রূপে (থাকার সম্ভাবনা)-র মিশ্রণ হয়ে যায়। ভোল পাল্টানোটা আবার তরঙ্গের মত পর্যায়ক্রমেও হতে পারে। একে ‘Neutrino Oscillation’ বলে। ভূতের মতই আচরণ বইকী!



୫) ବାମପଞ୍ଚୀ କଣାଃ

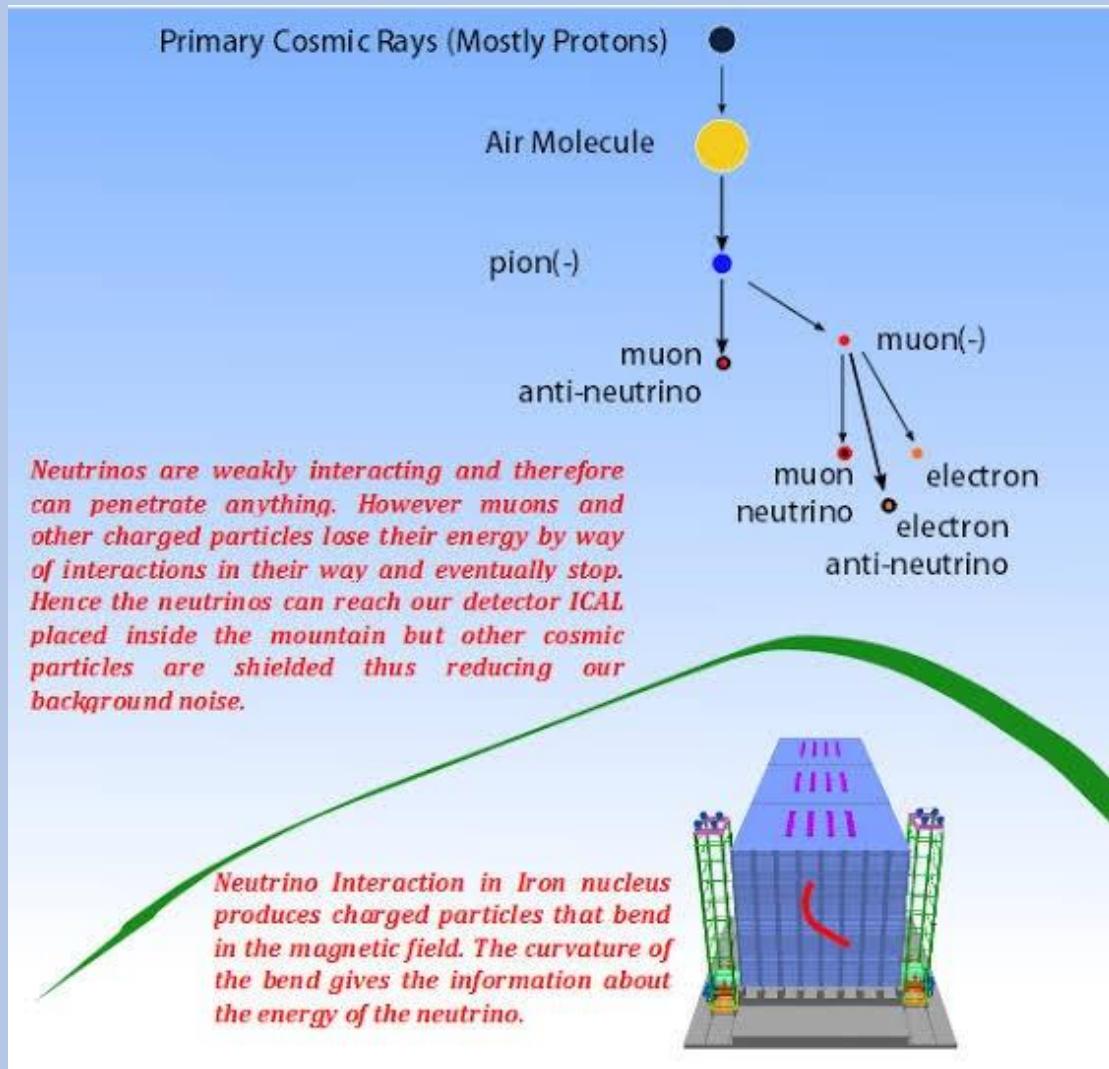
ହଁ ନିଉଟ୍ରିନୋ ତାଇ-ଇ। କଣା ପଦାର୍ଥବିଦ୍ୟାଯ କଣାଦେର ଏକଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନିଯେ ଆଲୋଚନା ହୁଯ ଯାକେ ବଲେ ‘Chirality’ (କାଇରାଲିଟି) ବା ‘Helicity’। ଦେଖା ଯାଯ (ଭରହୀନ କଣା ବାଦେ) ସମସ୍ତ କଣାଦେର କ୍ଷେତ୍ରେ ଗତିର ଅଭିମୁଖ ଓ ସ୍ପିନ-ଏର ଅଭିମୁଖେର ମଧ୍ୟେ କୋନଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକେର ସାପେକ୍ଷେ ଏକଟି କଣାର ଆପେକ୍ଷିକ ଗତିର ଅଭିମୁଖ ଭିନ୍ନ ହୁଯ ବଲେ (କିନ୍ତୁ ସ୍ପିନେର ଅଭିମୁଖ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଲେ) କଣାଦେର ଗତିର ଅଭିମୁଖ ଓ ସ୍ପିନେର ଅଭିମୁଖ ପରମ୍ପର ଏକଇ (ଏକେ ବଲେ ‘ଡାନହାତି ଆଚରଣ’ ବା Right-handedness) ବା ବିପରୀତ (ଏକେ ବଲେ ‘ବାଁ-ହାତି ଆଚରଣ’ ବା Left-handedness)- ଉଭୟଇ ହତେ ପାରେ।

କିନ୍ତୁ ଏଥନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାନା ସମସ୍ତ କଣାର ମଧ୍ୟେ (ଭରହୀନ ଫୋଟନ ବାଦେ) କେବଳ ନିଉଟ୍ରିନୋର ବେଳାୟ ଦେଖା ଯାଯ, ତାକେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ଦେଖୁକ ନା କେନ, ନିଉଟ୍ରିନୋର ଗତିର ଅଭିମୁଖ ଓ ସ୍ପିନେର ଅଭିମୁଖ ସର୍ବଦା ବିପରୀତ ହୁଯ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଉଟ୍ରିନୋ ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ବାଁ-ହାତି ଆଚରଣ କରେ। କି ସୃଷ୍ଟିଛାଡା ଆଚରଣ ରେ ବାବା!

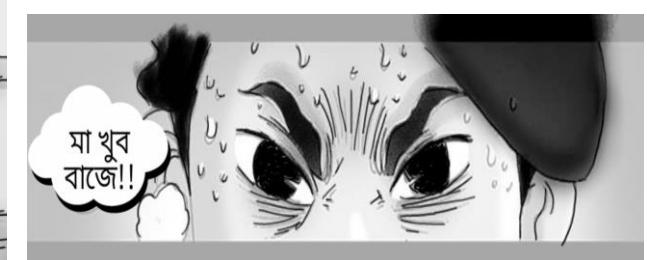
୬) (ହ୍ୟତ) ନିଜେଇ ନିଜେର ବିପରୀତ କଣାଃ-

এখনও পর্যন্ত জানা কগাদের মধ্যে কেবল ভরহীন কনা ফোটন (যার গোত্র হল ‘বোসন’, ফার্মিয়ন নয়) নিজেই নিজের বিপরীত কগা। ফার্মিয়নদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত সবাই আলাদা আলাদা বিপরীত কগা আছে। এই ধরণের ফার্মিয়নদের বলে ‘ডিরাক ফার্মিয়ন’। এমন সন্তাবনা আছে যে নিউট্রিনো হল একমাত্র ফার্মিয়ন যারা নিজেই নিজের বিপরীত কগা। এরকম ফার্মিয়নকে বলা হয় ‘মায়োরানা ফার্মিয়ন’। এখন পর্যন্ত আলাদা একটি কগা ‘অ্যান্টিনিউট্রিনো’কে নিউট্রিনোর বিপরীত কগা মনে করা হয়। নিউট্রিনো-অ্যান্টিনিউট্রিনোতে তফাং কেবল বাম/ডানহাতি আচরণে। তাই যদি নিউট্রিনোর ডানপন্থী রূপ পাওয়া যায় তবে বলা যাবে এযাবৎ জানা অ্যান্টিনিউট্রিনো আসলে আলাদা কগা নয় বরং নিউট্রিনো নিজেই- কেবল ডানপন্থী। সেক্ষেত্রে তা হবে একমাত্র ফার্মিয়ন যা নিজেই নিজের বিপরীত কগা। আবার অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, যদি বা ডানপন্থী নিউট্রিনো পাওয়াও যায় তা অনেকটা অন্যরকম হবে- অ্যান্টিনিউট্রিনোর মত হবে না। সেক্ষেত্রে নিউট্রিনোকে মায়োরানা ফার্মিয়ন নাও বলা যেতে পারে।

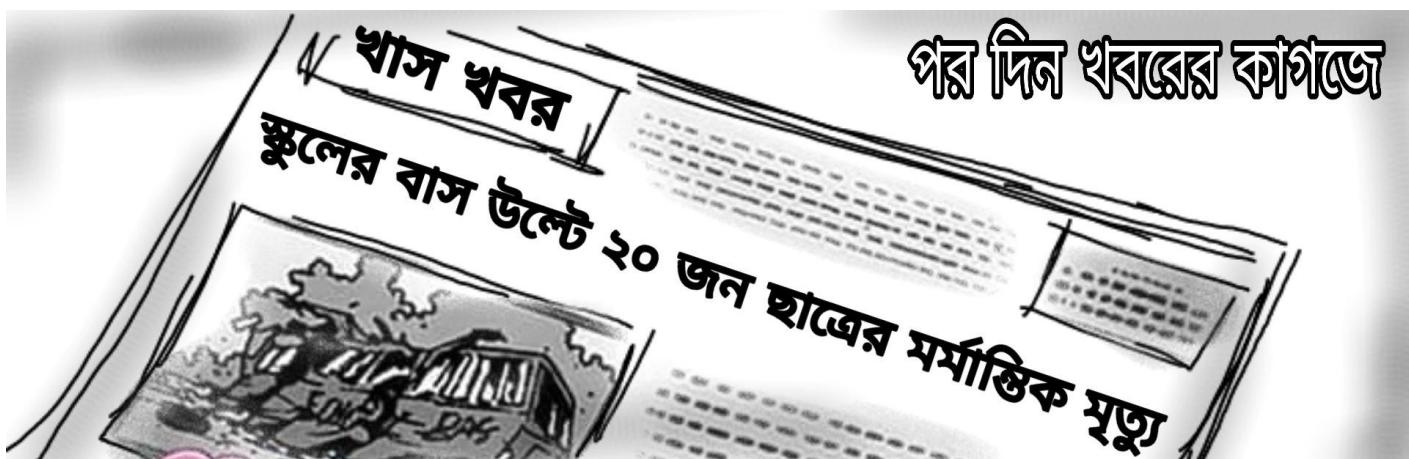
এইরকম সব অঙ্গুত বৈশিষ্ট্যের কারণে আর রহস্যময় বলে বলে একরণ্তি নিউট্রিনোকে নিয়ে মাঝেমাঝেই বিজ্ঞানীদের মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হয়! তাই একে আদর করে নাম দেওয়া হয়েছে ‘ভূতুড়ে কগা’।



(সমাপ্ত)







(সমাপ্ত)



ପ୍ରମାଣିତ

ଅଭିଶପ୍ତ ମାରିପୋସା

ରିମା ମାନ୍ଦା

ଲଲିତ ଚ୍ୟାଟୋଜି ଆର ତାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଜୟା ଦେବୀର ଛେଲେ ମଲୟ କର୍ମସୂତ୍ରେ ବିଦେଶ ଥାକେ ;
କିଛୁଦିନ ଆଗେ ମେଯେ ମାଲତୀଲତାରୁ ବିଯେ ହୟେ ଗେଲେ ଧୂମଧାମ କରେମେଯେର
ବିଯେର କଯେକମାସ ଯେତେ ନା ଯେତେଇ ହଠାତ୍ କରେଇ ଏକାକୀତ୍ବ ବୋଧ ହତେ ଶୁରୁ
କରେଛେ ଯେନ ଜୟା ଦେବୀରାଲଲିତ ବାବୁ ପେଶାୟ ଏକଜନ ଉକିଲ, ତାଓ ଆବାର ନାମ କରା
ଦୁଁଦେ ଉକିଲାସାରାଦିନ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟନ୍ତ ଥାକେନ ନିଜେର ନାନା ରକମ କ୍ଲାଯେନ୍ଟଦେର ସାଥେ
ବିଭିନ୍ନ କେସ ନିଯେ କାଯେଇ ସ୍ତ୍ରୀ କେ ସମୟ ଦେଓଯାର ମତ ସମୟ ତାଁର ବଳତେ ଗେଲେ
ପ୍ରାୟ ହେଁଇ ଓଠେ ନା।

ପ୍ରଥମଟାଯ ନିଜେର ଏକାକୀତ୍ବ କାଟାତେ ଦୁ ତିନଟେ ସଂ ସଙ୍ଗ୍ୟ-ଏ ଯାତାଯାତ ଶୁରୁ
କରେଛିଲେନ ଜୟା ଦେବୀ କିନ୍ତୁ ଓହ କଦିନେର ଜନ୍ମଟି ଶୁଧୁ! ଏକଟା ସମୟ ବିରତ୍ତି ବୋଧ
ହତେ ଲାଗଲୋ ଜୟା ଦେବୀରାସାରାଦିନଟା ଯେନ କିଛୁତେଇ ଆର କାଟାତେ ଚାଇଛେ ନା!
ବାଡ଼ିମୟ କାଜେର ଲୋକ, ତାଇ ଖାନିକଟା କାଜକର୍ମ କରେଓ ସେ ସମୟ କାଟାବେନ, ତାର
ଜୋ ନେଇ! କି କରେନ, କି କରେନ, ଏରକମ ଭାବଛନ, ହଠାତ୍ କରେ ମାଥାୟ ଏକଟା ଇଚ୍ଛା
ଚାପଲୋ, ବାଗାନ କରବେନ, ତାତେ ଅନେକଟାଟି ସମୟ କେଟେ ଯାବେ ତାଁର କିଛୁଟା ଜୋର
କରେଇ ଲଲିତ ବାବୁର ହାଜାର ଆପତ୍ତି ଥାକା ସତ୍ତ୍ଵେଓ ନିଜେ ବାଜାର କରତେ ଯେତେ ଶୁରୁ
କରେଛିଲେନ ଜୟା ଦେବୀ, ଆର ତଥନଟି ବାଜାରେ ଏକଜନ ଗାଢ଼ୀଯାଳା କେ କିଛୁ ଗାଢ଼
ନିଯେ ବସେ ବିକ୍ରି କରତେ ଦେଖେ ମାଥାୟ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଆସୋଯେମନ ଭାବା, ତେମନି
କାଜ;ବେଶ କଯେକଟା ଗାଢ଼ କିନେ ବାଡ଼ି ନିଯେ ଏଲେନ ଜୟା ଦ୍ୱୀପି।

ଶୁରୁ ହଲ ବାଗାନ କରାର କାଜ, ଏମନିତେ ସବ ନିୟମ ଜେନେଇ ଏସେଛେନ ତବୁଓ
ଗାଢ଼ୀଯାଳାର କାଢ଼ ଥେକେ ମନେ କରେ ଓର୍ବ ଫୋନ ନସ୍ବର ନିଯେ ଏସେଛେନ ଜୟା ଦ୍ୱୀପି,
ଯାତେ କଥନୋ

কোনো কিছু জানার দরকার পড়লে তৎক্ষণাত্মে জেনে নিতে পারেন। হোট করেই
বাগান তৈরি শুরু করলেন, পরে ধাপে ধাপে বাড়িয়ে নেবেন। বাড়ির ছাদে কয়েকটা
ফুলের টব

রাখা হল, বাকি চারাগাছ ওলো বাড়ির সামনের ঘেরা ফাঁকা জায়গাটাতে মাটি খুঁড়ে
পৌঁতা হল। এইসব দেখে স্বভাবতঃ কৃপণ ললিত বাবু মুখে জয়া দেবীকে কিছু
বললেন না ঠিকই, তবে মনে মনে খুব বিরক্ত হলেন ! এইবার শুরু হবে একগাদা
বাজে খরচ; এই ভেবে মনে মনে গজগজ করতে লাগলেন। তাঁর মনোভাব বেশ
বুঝতে পারলেন জয়া দেবী, তবুও মুখে কিছু বললেন না, চুলোয় যাক ললিত বাবুর
রাগ! নিজে যখন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, তখন কি ভাবেন তাঁর কথা?

ছেলে মলয় যখন জানতে পারলো মায়ের নতুন শখের কথা, বেশ সাপোর্টই
করলো, কিন্তু মালতীলতা তার বাবার দলে। কি যে দরকার কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা বেকার
খরচা করার কে জানে! এই নিয়ে একচোট ফোনে কথা কাটাকাটি হয়ে গেলো মা
মেয়ের। কিন্তু জয়া দেবী পাতা দিলেন না কাউকে; মনের সুখে কদিন ছাড়া ছাড়াই
নতুন নতুন গাছ লাগাতে শুরু করলেন।

এদিকে ললিত বাবু আর কোনো উপায়ান্তর না দেখে অন্তুত অন্তুত যুক্তি দিতে শুরু
করলেন, কখনো বললেন খুব মশা বেড়েছে, আবার কখনো বললেন সাপের উপদ্রব
হবে, কি দরকার বাড়িময় আগাছা বাড়িয়ে! উত্তর নিয়ে তৈরীই ছিলেন জয়া দেবী,
বললেন, কোনা ভয় নেই, দামী দামী ওষুধ স্প্রে করা হয়েছে, কাজেই ললিত বাবুর
কোনো ও জোর আপত্তি চললো না।

ବାପେର ବାଡ଼ିତେ ଏକଟା ମାଲତୀଲତା ଗାଛ ଛିଲ ଜୟା ଦେବୀଦେଇ; ବଲତେ ଗେଲେ ଗାଛେର ପ୍ରତି ପ୍ରେମଟା ଜୟା ଦେବୀର ଛେଲେବେଳା ଥେକେଇ ଆର ସେଇ ସୂତ୍ରେଇ ଯଥନ ମେଯେର ଜନ୍ମ ହଲ, ତଥନ ଏହି ମାଲତୀଲତା ଗାଛେର ନାମେଇ ମେଯେର ନାମ ରେଖେଛିଲେନ ତଥନ କି ଆର ଜାନତେନ ଯେ ଯାର ନାମ ସେଇ ଗାଛେର ନାମେ, ସେଇ ମେଯେରଟି ଗାଛେର ପ୍ରତି କୋନୋ ଭାଲବାସା ଥାକବେ ନା! ଉଲ୍ଟେ

ବାପେର ସାଥେ ତାଲେ ତାଲ ମିଲିଯେ ବଲଛେ ବାଡ଼ିତେ ବେକାର ଜଞ୍ଜାଳ ବାଡ଼ାନୋର କି ଦରକାର! ଏହି ଭେବେ ଏକଟା ଦୀର୍ଘାଶ୍ଵାସ ଫେଲିଲେନ ଜୟା ଦେବୀ। ଆଜ ସକାଳେ ମଲଯେର ଫୋନ ଏସେଛିଲ ଲସ ଏଙ୍ଗେଲସ ଥେକେ; ଓ ସେଥାନେ ଥାକେ, ସେଥାନେ ଏକଟା ନାମକରା ପାର୍କ ଆଛେ, ବିଶାଳ ଏଲାକା ଜୁଡେ, ଆର ନାନା ରକମେର ଗାଛ, ପଣ୍ଡ - ପାଖିର ବାସ ସେଥାନେ। ଏକଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଫୁଲଓଯାଲିର ସାଥେ ମଲଯେର ପରିଚଯ ହେଲେ, ମେଯେଟା ଖୁବ ଗରିବ, ଓ ଓଥାନେ ଗାଛ ବିକ୍ରି କରେ, ଏମନିତି ଓଥାନକାର ଗାଛେର ଦାମ ଖୁବ ବେଶି କିନ୍ତୁ ମେଯେଟା ଅନେକ କମ ଦାମେ ଏକଟା ଲିଲି ଫୁଲ ଗାଛେର ବୀଜ ଦିଯେ ଦେବେ ବଲେଛେ। ତୃକ୍ଷଗାନ୍ଧ ଜୟା ଦେବୀ ହଁ ବଲେ ଦିଲେନ; ବିଦେଶେର ଫୁଲ ଗାଛ ବଲେ କଥା; ତାଁର ତୋ ବାଗାନେର ଶୋଭାଇ ଦୁ ଶୁଣ ବେଡେ ଯାବେ! ଆର ସବାଇ କେ ବେଶ ଗର୍ବ କରେ ଦେଖାତେଓ ପାରବେନ।

କିଛୁଦିନେର ମଧ୍ୟେଇ ଜୟା ଦେବୀର ହାତେ ଲିଲି ଗାଛେର ବୀଜ ଚଲେ ଏଲୋ ବିଦେଶ ଥେକେ। ବେଶ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାକେଟ କରେ ପାଠିଯେଛେ ଛେଲେ, ଖୁବ ଖୁଶି ହଲେନ ଜୟା ଦେବୀ ବିନ୍ଦୁମାତ୍ର ଦେଇନ ନା କରେ ମାଲି କେ ଡେକେ ବୀଜ ପୌତାର କାଜ ଶୁରୁ କର ଦିଲେନ ତିନି। ହୋୟାଟସଅ୍ୟାପେ ଫୁଲେର ଏକଟା ଛବିଓ ପାଠିଯେଛେ ମଲଯ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପୀ ରଂ ଏର ଫୁଲଟା ଦେଖିତେ, ନାମଓ କି ଯେନ ଏକଟା; କିନ୍ତୁ ନାମ ଭାରୀ ଶକ୍ତା।

গত দুদিন খরেই শরীর টা বিশেষ ভালো নেই জয়া দেবীর ;পেট খারাপ এর সাথে
বমি আর জ্বর ভাব।

ডাক্তার বলেছেন, পেটে কোনোরকম ইনফেকশন থেকে এরকম হচ্ছে ওষুধ
চলছে বটে কিন্তু এখনও পর্যন্ত শরীরের কোনোরকম উন্নতির লক্ষণ নেই।

অরুচির কারণে কিছু সেরকম খেতেও ইচ্ছা করছে না, তাই দুর্বল ভাবও লাগছে
তাও মনটা ভালো আছে এই জেনে যে এতদিন পর মলয় ফিরবে বিদেশ থেকে,
সাথে নাকি আরো ফুলের

গাছ নিয়ে আসছে! সবই লিলি ফুলের গাছ, তবে বিভিন্ন রকমের।

বিছানা ছেড়ে উঠতে গিয়ে কিঞ্চিৎ মাথা টা একট ঘুরে গেলো মনে হলা জয়া
দেবীর। শরীর দুর্বল, তাই এটা খুবই স্বাভাবিক; যাইহোক, শরীরটা কে কোনোরকম
টেনে টেনে উঠে ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে এসে বারান্দায় রাখা ঝাঁঝরিটা তুলে
নিলেন জয়া দেবী, তারপর কল থেকে তাতে জল ভরে নিয়ে আঙ্গে আঙ্গে সিঁড়ি
দিয়ে উঠে ছাদে গেলেন। আজ লিলি গাছটাকে দেখে খুব প্রাণবন্ত বলে মনে হচ্ছে!

গত দুদিন গাছে জল দিতে আসতে পারেন নি জয়া দেবী, বাড়ির কাজের লোকেই
জল দিয়েছে, দুদিন দেখেন নি বলেই হয়তো এরকম মনে হচ্ছে তাঁর। বারবার চোখ
চলে যাচ্ছে তাঁর লিলি গাছটার দিকে; অঙ্গুত ব্যাপার এই যে, গাছটাতে শুধু একটাই
ফুল ফোটে, এরকম সাধারণত হয় না, কিন্তু যবে থেকে এসেছে গাছটা, জয়া দেবী
খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন, কুঁড়ি অনেকগুলো ফুটলেও একটাই
ফুল ফোটে, অন্য গুলো ঝরে পড়ে

ଯାଯ! ନାହଁ ଆଜ ସତିଇ ଅନ୍ୟ ରକମ ଲାଗଛେ ଗାଛଟା କେ ଭୀଷଣ ଭୀଷଣ ପ୍ରାଣବନ୍ତ , ଯେନୋ ଏଖୁନି କଥା ବଲେ ଫେଲବେ!!

ନିଚେ ନିଜେର ଅଫିସେ ବସେ ଏକଟା କେସ ନିୟେ ଗଭୀର ମନୋଯୋଗ ଦିୟେ ଚିନ୍ତା କରିଲେନ ଲଲିତ ବାବୁ; ହଠାତ୍ ଜୋର ଏକଟା ଆଓଯାଜ ଶୁଣେ ଛୁଟେ ସିଁଡ଼ିର କାହେ ଏମେହ ଦେଖିଲେନ ଯେ, ମାଟିତେ ଉଲ୍ଟେ ପଡ଼େ ଆଛେନ ଜୟା ଦେବୀ, ରଙ୍ଗେ ଭେସେ ଯାଛେ ଜାୟଗାଟା! ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜୟା ଦେବୀକ ଧରେ କାଜେର ଲୋକଦେର ହାଁକ ଦିଲେନ ଲଲିତ ବାବୁ।

ଗୋଟା ଘରେ ପିନ ପଡ଼ା ନିଞ୍ଜନ୍ତା, ଏକଟା ଇଂଜି ଚେଯାରେ ଶରୀର ଏଲିଯେ ବସେ ଆଛେନ ଲଲିତ ବାବୁ, ତାଁର ପାଯେର କାହେଇ ବସେ ଆଛେ ମାଲତୀଲତା; ଥମଥମେ ମୁଖ, ଚୋଖେର କୋଣେ ଜଳ ଚିକଚିକ କରଛେ। ଲଲିତ ବାବୁର ଜାମାଇ ଅନୁଭବ ଏଥିନ ମୁମ୍ବାଇ ଗେଛେ, କାରଣ, ଗତକାଳ ଲସ ଏଞ୍ଜ୍ଲେସ ଥେକେ ଦେଶେ ଫେରାର ପଥେ ମାରାତ୍ମକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟନାୟ ମାରା ଗେଛେ ମଲଯ !! ଜୟା ଦେବୀ ସିଁଡ଼ି ଥେକେ ପଡ଼େ ଗିଯେ ମାରା ଗେଛେନ ଆଜ ଦୁଦିନ ହଲ, ମଲଯ ଏହି ଖବର ପେଯେ ତୃକାଲୀନ ବିମାନେର ଟିକିଟ ପାଇନି, ତାଇ ପରେର ଦିନ ଅଥାତ୍, ଗତକାଳ ଆସାର କଥା ଛିଲ ଓର, ଆର ଆସାର ପଥେଇ ଏହି ସ୍ଟାଟନା! ଏକସାଥେ ପର ପର ଏହିରକମ ଦୁର୍ଘଟନାୟ ଶୋକେ ପାଥର ହୟେ ଗେଛେନ ଲଲିତ ବାବୁ। ମାଲତୀଲତା ଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବାରେର ସଦସ୍ୟରାଓ ପୁରୋ ସ୍ତର ।

ସମସ୍ତ କାଜ ମିଟିତେ ମିଟିତେ ପ୍ରାୟ ଏକମାସ ମତ ଲେଗେ ଗେଲୋ, ଲଲିତ ବାବୁ ସ୍ଥିର କରିଲେନ, ଆଜଇ ବାଡ଼ି ଥେକେ ସମସ୍ତ ଗାଛ ବିଦାୟ କରିବେନ, ଏହି ଗାଛଟି ଯତୋ ନଷ୍ଟେର ଗୋଡ଼ା, ତାଁର ସ୍ତ୍ରୀ-ପୁତ୍ର କେ କେଡ଼େ ନିଯେଛେ। ପ୍ରଥମ ଥେକେଇ ଏସବ ପଚନ୍ଦ ଛିଲ ନା ତାଁର, ତାରଓପର ଏରକମ ଚରମ ଏକଟା ଆଘାତ, ତାଁର ରାଗେର ମାତ୍ରା ଆରୋ ଦ୍ଵିତୀୟ ବାଡ଼ିଯେ

দিয়েছে! বাড়ির কাজের লোকেদের কালই ছাদের ফুলের টব গুলো ফেলে দিতে
বলেছিলেন, মালিকে ডেকে

বাগান সাফ করিয়ে, যতো গাছে ছিল সব কেটে পরিষ্কার করে দিতে বলে, নিজে
ছাদে গেলেন; ওপরই আছে ওই হতচ্ছাড়া লিলি গাছ টা! গিন্নিমার প্রিয় গাছ ছিল
বলে নাকি ব্যাটারা মায়ায় ফেলতে পারে নি, কিন্তু ললিত বাবুর ওসব মায়া টায়া চলে
গেছে, আসল মানুষটাই যখন নেই, তখন আর গাছের মায়া করে কি হবে?

দুপুরের নিউজ চ্যানেলে খবরটা দেখে হাতে তোলা ভাত টা ঝরঝর কর পড়ে গেল
মালতীলতার, নিজের চোখ কানকে যেনো বিশাসই করতে পারছে না ও; কিছুক্ষণ
আগেই তপসিয়া ক্রসিং এর কাছে মারাত্মক গাড়ি দুঃটনায় মৃত্যু হয়েছে প্রখ্যাত
উকিল ললিত চ্যাটার্জীর!! কয়েক ঘন্টা আগে অনেকবার ফোন করেছিলো
মালতীলতা, একটা ব্যাপার নিয়ে বাবার সাথে আলাচনা করবে বলে, কারণ সে যা
শুনেছিল, তার সত্যতা কতটা সেই নিয়েই বাবার কাছ জানার ছিল। আর সেই
সত্যতা প্রমাণ করে দিয়েছেন ললিত বাবু তাঁর অজান্তেই কারণ, মালতীলতার
ভাসুরের মেয়ে বোট্যানির ছাত্রী, আজ সকালে ওর কলেজ থেকে হঠাত ফোন করে
অঙ্গুত একটা কথা জানিয়েছিল মালতীলতাকে; জয়া দেবী যেই লিলি ফুলের গাছটা
লাগিয়েছিলেন, সেটা বিখ্যাত গ্রিফিথ পার্কের যেটা লস এঞ্জেলস এর লস ফেলিজ,
এর প্রায় ৪,৩১০ একর জুড়ে, পার্কটির মালিক ছিলেন ডন অ্যান্টোনিও ফেলিজ,

যিনি তাঁর একমাত্র ভাইকি ডোনা কে নিজের সম্পত্তি থেকে বহিষ্কার করেন বিনা
কারণে এবং শোনা যায় যে ডোনারও হঠাতে করেই কোন অজ্ঞাত কারণে মৃত্যু
হয়াস্থানীয় লোকেরা এটাকে খুন বলেই মনে করেন আর তারপর থেকেই শুরু হয়
ফেলিজ পরিবারে একের পর এক অস্বাভাবিক মৃত্যু !!

স্থানীয় লোকদের মুখে শোনা যায় যে, ‘মারিপোসা’ নামে এক ধরণের লিলি ফুল
খুব প্রিয় ছিল ডোনার, আর যারা যারা মারা গিয়েছেন, তারা প্রত্যেকেই মৃত্যুর ঠিক
আগে ওই লিলি ফুল হাতে ডোনা কে নাকি অস্পষ্ট দেখতে পেত! মৃত্যুশয্যায়
থাকাকালীন তারা নাকি এগুলো বলে গেছে। তাই যে ওই অভিশপ্ত ফুল স্পর্শ
করবে, কয়েকদিনের মধ্যেই তার মৃত্যু অবধারিত, সে যেভাবেই হোক!

তাহলে কি মা, ডোনাকে দেখেই ভয়ে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিলেন? বাবার
ড্রাইভারও কি আচমকা চোখের সামনে ডোনাকে দেখেছিল বলে উল্টোদিক থেকে
আসা লরিটাকে দেখতে পায়নি?

আর মলয়? ওকে ফুলের বীজ বিক্রি করতে কে এসেছিল তবে???????????

(সমাপ্ত)

আদ্রা

শুভদীপ চেল

আঁকার পাতা

প্রিয়াঙ্কা মাহাতো



বয়স – ১৪, আদ্রা (পুরুলিয়া)



বয়স – ২০, আদ্রা (পুরুলিয়া)

শুভক্ষর তিওয়ারি



বয়স – ১৬, আসানসোল

নেরিত প্রধান



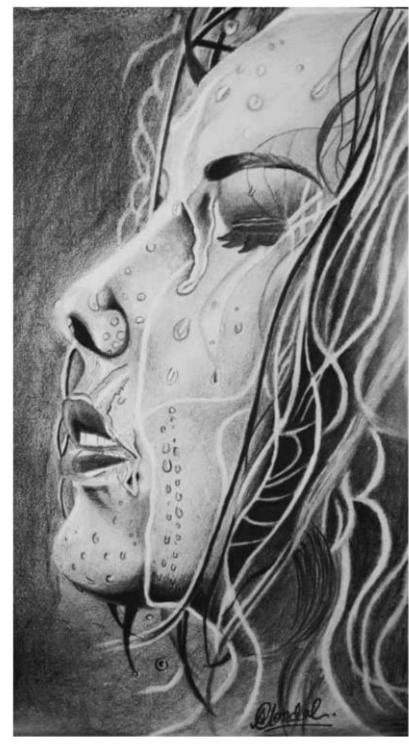
বয়স – ১৩, আদ্রা (পুরুলিয়া)

আদ্রা

অঙ্গিতা মন্ডল

আঁকার পাতা

রূদ্রাণী দে

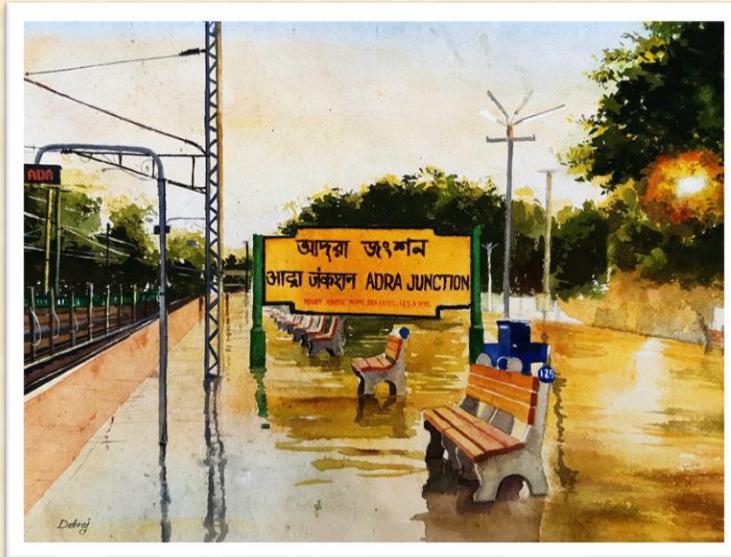


বয়স – ২১, চিওরঞ্জন



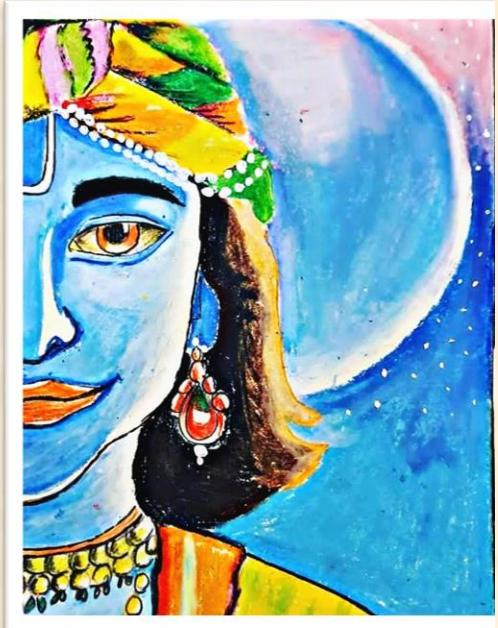
বয়স – ১৮, আদ্রা (পুরুলিয়া)

দেবরাজ ভট্টাচার্য



বয়স- ২০, আদ্রা (পুরুলিয়া)

অঙ্কিত বিশ্বাস



বয়স – ১৫, বোকারো স্টিল সিটি (ঝাড়খণ্ড)

আদ্রা

সন্ধিতা সামন্ত

অঁকার পাতা

অঙ্কুর দণ্ড



বয়স – ১৩, আদ্রা (পুরুলিয়া)

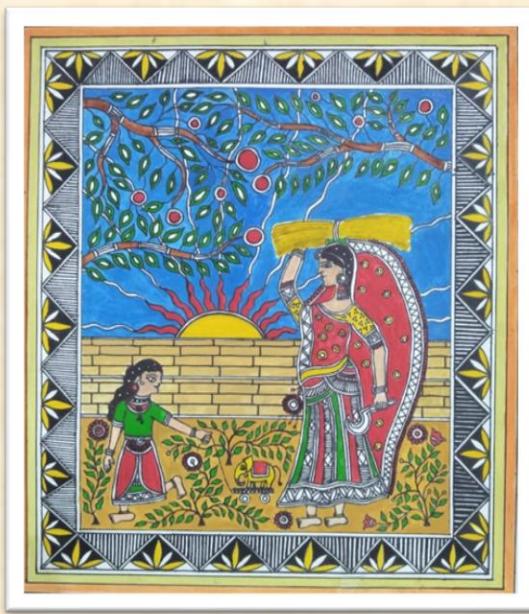


বয়স- ১৮, আদ্রা (পুরুলিয়া)

ঞাষিতা প্রধান

কিশান কর্মকার

নিচের ছবিটি পুরোপুরি মেহেন্দি দিয়ে অঙ্কন করা



বয়স – ১৩, আদ্রা (পুরুলিয়া)



বয়স – ২৪, আদ্রা (পুরুলিয়া)

ଆର୍ଦ୍ର

ଫଟୋଗ୍ରାଫି

“ସ୍ଵପ୍ନେର ପୁରୁଳିଯା”

“ଇତିହାସ ସଖନ ମେଶେ ପ୍ରକୃତିର ସାଥେ”



ସୁମନ କର୍ମକାର

“ହାଟ ବସେଛେ ଶୁକ୍ରବାରେ”



ସମୀରଣ କୁଣ୍ଡ

“ଅନ୍ତାଚଲେ”



ସାତ୍ୟକୀ ଦେ

“ଜଳଛବି”



ରାହୁଳ ମାଜୀ

“ରୁଜିର ଟାନେ ପଥ ଚଲେ ଯାଯା”



ଅଭିଜିତ କର୍ମକାର

আর্দ্ধ

ফটোগ্রাফি

“স্বপ্নের পুরুলিয়া”

“দুমদুমি পাওয়ার প্লান্ট”



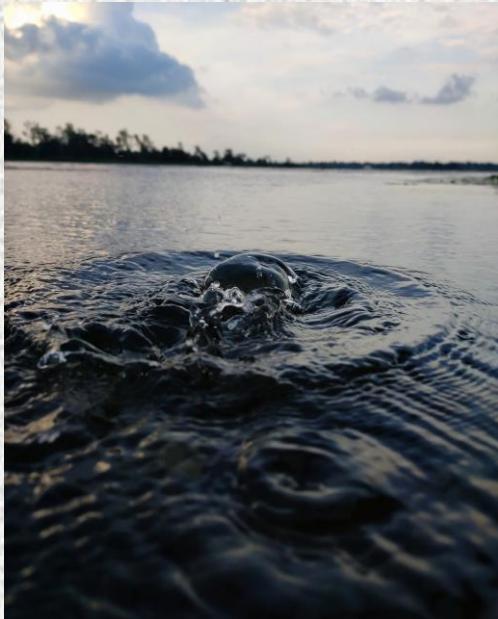
নীলাঞ্জন গরাঁই

“শিল্পীর আবেগ প্রতিটি মুখে”



সৌরভ গুপ্ত

“সাহেব বাঁধে মুক্ত ভাসে”



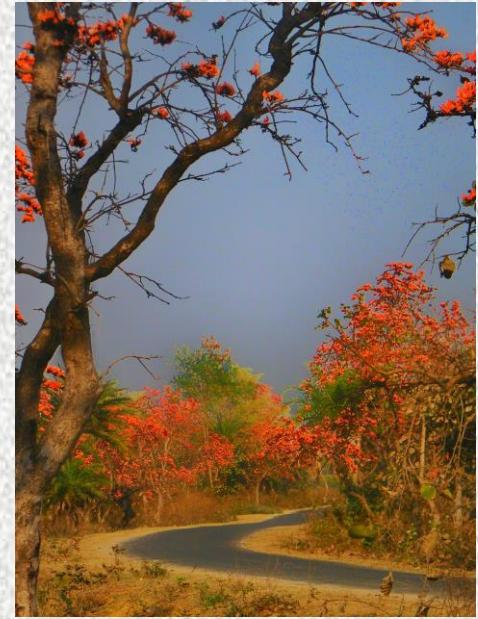
রণিত মাজী

“বেলাশেষে”



সৌম্যকান্তি সাহু

“পুরুলিয়া লাল পলাশে চিরকাল”

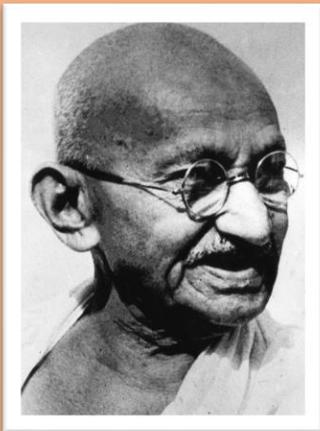


পার্থ চ্যাটার্জী

কৃষ্ণজি

1) কে মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠা করেন?

উং- ঢাকার নবাব সালিমউল্লাহ।

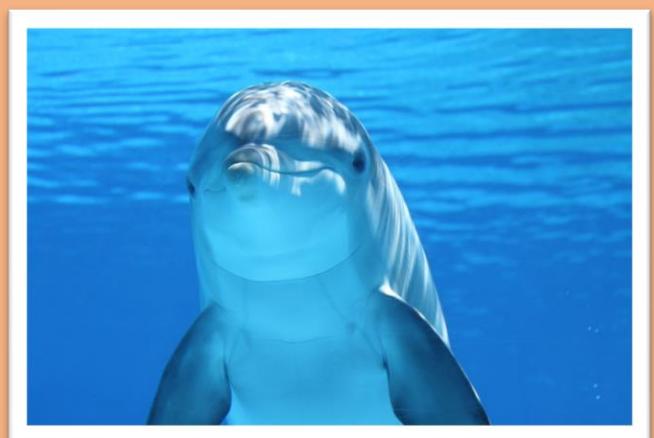


2) গান্ধিজিকে 'মহাত্মা' বলে সম্মোধন করেন কে?

উং- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

3) লেনিনের পুরো নাম কী?

উং- ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেনিন।



4) ভারতের জাতীয় জলজ প্রাণীর নাম কী?

উং- ডলফিন।

5) রোটাং গিরিপথ কোন রাজ্যে অবস্থিত?

উং- হিমাচাল প্রদেশ।

6) জন্ম - কাশ্মীরের মানুষ কোন ভাষায় কথা বলে?

উং- ডোগরী।

7) ফল পাকানোর জন্য কোন গ্যাস ব্যবহৃত হয়?

উং- ইথিলিন।

8) ক্লোন করা প্রথম ভেড়াটার নাম কী?

উং- ডলি।

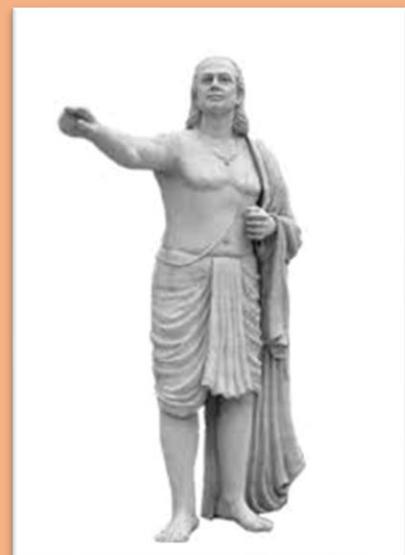


9) প্লাস্টার অব প্যারিস তৈরী হয় কী দিয়ে?

উং- জিপসাম।

10) সূফিসিদ্বান্তিকা গ্রন্থের লেখক কে?

উং- আর্যভট্ট।

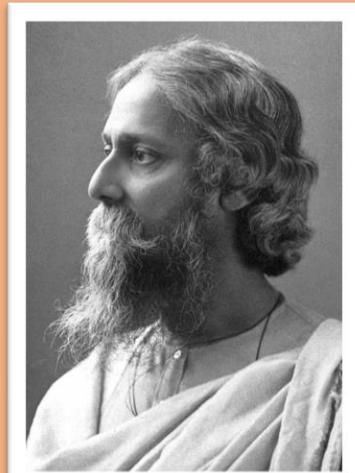


11) "মাই আর্লি লাইফ" কার লেখা?

উং- মহাত্মা গান্ধী।

12) 'বুড়ো আংলার' আসল নাম কি?

উং- রিদম।

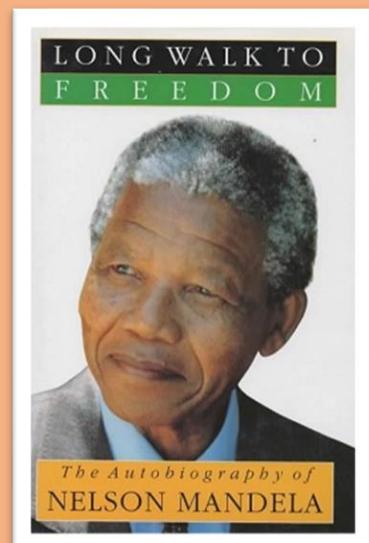


13) 'আনাকালী পাকড়াশি' কার ছদ্মনাম?

উং- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

14) ধুনা কি?

উং- শাল গাছের আঠা।



15) 'Long walk to freedom'-কার লেখা?

উং- নেলসন ম্যান্ডেলা।

16) টারজানের আসল নাম কী?

উং- লর্ড গ্রোস্টক।

17) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচালিত একটি চলচিত্রের নাম কী?

উং- নটীর পূজা।

18) 'হ্যারিপটার' সিনেমায় হ্যারি পটারের ভূমিকায় কে অভিনয় করেছেন?

উং- ড্যানিয়েল র্যাডক্লিফ।



19) আলেকজান্ডারের ঘোড়ার নাম কী?

উং- বুসিফেলাস।

20) কুরক্ষেত্র কোন রাজ্য অবস্থিত?

উং- হরিয়ানা।

21) কাবাডি খেলায় কতজন খেলোয়াড় থাকে?

উং- 7 জন।

22) 'সকার' এই খেলাটাকে আমরা কি নামে চিনি?

উং- ফুটবল।

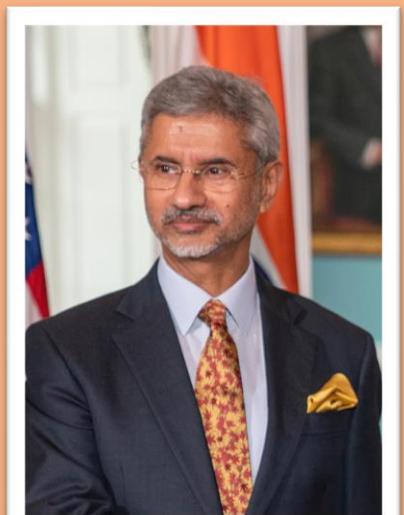


23) 2019 এ আইসিসি বিশ্বকাপে সর্বাধিক রান করেন কে?

উং- রোহিত শর্মা।

24) কোন বিখ্যাত ক্রিকেটার এর মেয়ের নাম "ইন্ডিয়া"?

উং- সাউথ আফ্রিকান ক্রিকেটার "জন্টি রোডস" এর মেয়ের নাম।

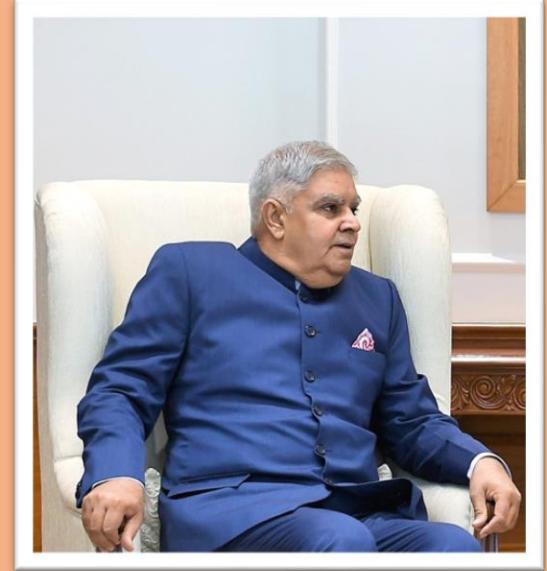


25) প্রথম ভারতীয় ব্যারিস্টার কে?

উং- জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

26) ଭାରତେର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀର ନାମ କି?

ଉଳ୍ଟୁ- ଏସ.ଜ୍ୟୋତିଶ୍ୱର ।



27) ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗେର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟପାଲେର ନାମ କି?

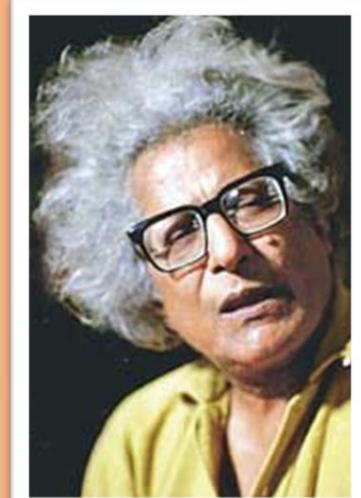
ଉଳ୍ଟୁ- ଜଗଦ୍ଧାରୀପ ଧନଖଡ଼ ।

28) ଚୀନେର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ନାମ କି?

ଉଳ୍ଟୁ- ଶି ଚିନଫିଂ ।

29) 'ଆଲ କାଯଦା' ଶବ୍ଦେର ଅର୍ଥ କି?

ଉଳ୍ଟୁ- ଭିତ୍ତିଭୂମି ।



30) 'କାଲ ମଧୁମାସ' କାର ଲେଖା?

ଉଳ୍ଟୁ- ସୁଭାଷ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ।

খেলার পাতা

1.) মোতেরা স্টেডিয়াম (বর্তমান নাম নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম) পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক দর্শন আসন সংখ্যা বিশিষ্ট ক্রিকেট মাঠ।



2.) 13 তম ICC World Cup অনুষ্ঠিত হবে ভারতে।

3.) 32 তম গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক টকিয়োয় হওয়ার কথা ছিল।

4.) ভারতীয় ক্রিকেটার টি. নটরাজন প্রথম ক্রিকেটার যিনি মাত্র 44 দিনের মধ্যে ক্রিকেটের 3 টি ফরম্যাটে অভিষেক করেন।

5.) মহিলাদের T- 20 ক্রিকেটে নিউজিল্যান্ডের সোফিয়া ডিভাইন দ্রুত শতরান করার রেকর্ড গড়েন।



6.) ICC "Spirit of the Cricket Award of the Decade" পেলেন M.S. Dhoni.

7.) 7 ବାରେର ଫର୍ମୁଲା ଓଯାନ ଚ୍ୟାମ୍ପିଯନ ଲୁହ୍ସ ହ୍ୟାମିଳ୍ଟନକେ ଇଉନାଇଟ୍‌ଟେଡ କିଂଡମ "ନାଇଟ୍‌ହ୍ୱୁଡ୍" ସମ୍ମାନେ ଭୂଷିତ କରଲୋ।

8.) ଆଇସିସି "ମେନ କ୍ରିକେଟାର ଅଫ ଦ୍ୟ ଡିକ୍ରେଡ" ବିରାଟ କୋହଲି ପେଲେନ ଏବଂ ଆଇସିସି "ଓମେନ କ୍ରିକେଟାର ଅଫ ଦ୍ୟ ଡିକ୍ରେଡ ଅସ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏଲିସ ପେରି ପେଲେନ।



9.) ଭାରତେର ପ୍ରାତଞ୍ଚନ କ୍ରିକେଟାର ନିତୁ ଡେଭିଡ଼କେ ଭାରତେର ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଲେର ନିର୍ବାଚନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୋଗ କରା ହଲୋ ।

10.) 2021 ଓଯାର୍ଲ୍ଡ ଟେସ୍ଟ ଚ୍ୟାମ୍ପିଯନଶିପେର ଫାଇନାଲ ଖେଳା ହବେ ଭାରତ ଓ ନିଉଝିଲ୍ୟାନ୍ଡେର ମଧ୍ୟେ।





পেত্তীর ইন্টারভিউ
অমল মাজী

এবছর বিশ্ব পেত্রী সুন্দরী প্রতিযোগিতায় জয়ী ভারতের বিখ্যাত শ্যাওড়া গাছের পেত্রী।

তার জয়ে ভারতের ভূত সমাজ খুবই গর্বিত। সেই পেত্রীরই একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি ড্রাকুলা। এই সাক্ষাৎকার দেখানো হবে রাত বারোটার সময় ভূত-পেত্রী চ্যানেলে। রাত বারোটায় সাক্ষাৎকার শুরু হলো-

প্রশ্ন:- আপনি কীভাবে মরে পেত্রী হলেন?

উত্তরঃ- আমি প্রথমে ভেবেছিলাম ৫ তলা ছাদের উপর থেকে ঝাঁপিয়ে মরবো। কিন্তু এত উপর থেকে পড়ে যদি ফিগার নষ্ট হয়ে চেহারাটা খারাপ হয়ে যায়, তাই এভাবে মরা হলো না। তারপর ভাবলাম পাথায় ঝুলে মরবো কিন্তু সেভাবে মরতে হলে পাথাটাকে বন্ধ করতে হয়। তবে জানেন তো আমার আবার গরম একেবারে সহ্য হয় না। তাই এটাও ক্যানসেল করতে হয়।

তাই শেষ অব্দি অনেকগুলো ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে গেলাম। ঘুমোতে ঘুমোতে কখন যে মরে গেলাম জানতেই পারলাম না।

প্রশ্নঃ- আপনি ভয় দেখান কী করে ?

উত্তরঃ- প্রথমে আমি আমার পেত্রী হাসি

শোনাই। তাতে ভয় না পেলে নকল বড় বড় দাঁত, বড় বড় নখ, চোখে কণ্ট্যাক্ট লেন্স লাগিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করি।

প্রশ্নঃ- তাতেও যদি ভয় না পায়?

আর্দ্ধ

উত্তর:- তখন ভুতুড়ে পরিবেশ ক্রিয়েট করে ভুতুড়ে সাউন্ড ইফেক্ট শুনিয়ে অঙ্ককারে সাদা শাড়ি পড়ে তার বাড়ির জানালায় গিয়ে দাঁড়াই।

আর্দ্ধ

প্রশ্ন:- তাতেও যদি ভয় না পায় ?

উত্তর:- তাহলে আমিই সেখান থেকে ভয় পালাই।

প্রশ্ন:- আপনার দিন কীভাবে কাটে?

উত্তর:- আমাদের তো দিন কাটেনা আমাদের তো কাটে রাত ,রাত। নাটার সময় ঘূম থেকে উঠি। মেকআপ করে রাত বারোটায় কোনো ফাঁকা রাস্তায় সুন্দরী মেয়ে সেজে লিফ্ট চাই। যদি কেউ লিফ্ট দেয় তবে তার গাড়িতে চেপে নিজের আসল চেহারা দেখিয়ে এমন ভয় দেখাই যে সে অ্যাক্সিডেন্টেই গয়াং গচ্ছতি।

প্রশ্ন:- এভাবে আপনি ভালো লোকদের মেরে ফেলেন কেন?

উত্তর:- রাত বারোটায় যারা সুন্দরী মেয়েদের লিফ্ট দেয় তারা কোনদিন ভালো হতে পারে না।

প্রশ্ন:- আপনি কী করে জানলেন?

উত্তর:- একদিন আমি বুড়ি সেজে রাস্তায় সারারাত দাঁড়িয়েছিলাম কেউ আমায় লিফ্ট দিল না!!

শেষে পল্টুর রিকশায় করে বাড়ি ফিরতে হলো।

প্রশ্ন:- আপনি একজন মডেল, সিনেমা করেন না?

উত্তরঃ- যখন ইচ্ছা হয় যে কোনো অভিনেত্রীর শরীরে তুকে পড়ি আর তাকে দিয়ে আমার ইচ্ছে মতো অভিনয় করিয়ে নিই। আজ আপনারা যে এত অভিনেত্রীর সফলতা দেখলেন সেটা তো আমারই জন্য।

প্রশ্নঃ- আপনি কোন অভিনেত্রীর শরীরে প্রবেশ করতে বেশি পছন্দ করেন?

উত্তরঃ- একটাই অভিনেত্রী আছে, মল্লিকা। কেন, সেটা বলতে পারবো না।

প্রশ্নঃ- আপনি আপনার ফিগার কীভাবে মেনটেন করেন?

উত্তরঃ- প্রথমের রাত ৭ টায় উঠে এক প্লাস মানুষের রক্ত খেয়ে নি। মানুষের রক্ত না হলে মুরগির রক্ত দিয়ে কাজ চালাই। তারপর দু'ঘণ্টা জিমে মানে গাছের ডাল ধরে ঝুলে থাকি। রাত বারোটার সময় পচা মাছের ঝোল দিয়ে পাত্তা ভাত। বিকেলে পচা ডিমের অমলেট আর ভোররাতে কিছু একটা হালকা খাবার, ব্যাস! এখন তো সকাল দশটা হয়ে গেছে। আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। আমি চলি বাঁই বাঁই.....।

আজ আপনারা জানলেন যে মরে পেত্তী হওয়ার পরেও সুন্দরী মেয়েদের কী ভীষণ ট্যানট্রাম! আজ এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন আমাদের আর্লি মর্নিং টক শো ঘণ্টাখানেক সঙ্গে মামদোনমস্কার।

(সমাপ্ত)

এলভিন সোয়াৎজের “দি বিগ টো” গল্পের ছায়া অবলম্বনে



আঙুল

একটি বাচ্চা ছেলে তার ঘরের পাশের ছোট বাগানের বেড়ার পাশে বসে, একটুকরো জমির
মাটি হাত দিয়ে খোঁড়ার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ জায়গাটার কোণে অনেকটা পায়ের পাতার
মতোন দেখতে একটি বড় শালগমসদৃশ বস্তু পড়ে থাকতে দেখল। সে এবার ওটাকে ধরে
টানাটানি শুরু করে দিল। কিন্তু সেটি মাটির ভিতে কোন একটা বস্তুর সাথে খুব দৃঢ়ভাবে
আটকে ছিল। ছেলেটা এবার তার গায়ের সমস্ত জোর লাগিয়ে মারল এক হ্যাঁচকা টান আর
সঙ্গে সঙ্গে জিনিসটা খুলে তার হাতে চলে এল আর প্রায় আচমকা একটা চাপা মৃদু গর্জন
আর ধূপধাপ চলার শব্দ মিলিয়ে গেল বেড়ার ওপারে দূরে।

ছেলেটি সেটি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে তার মায়ের কাছে রান্নাঘরে এল।

“বাহ্, এটা তো বেশ পুরু আর মাংসল, এটা দিয়ে আমরা স্যুপ রান্না করে ডিনারে খেতে পারি। তাই না?” ছেলেটির মা বলল।

সেই রাতে ছেলেটার বাবা ডিনার টেবিলে ওটার তিনটুকরো করল। তারা তিনজনে একেকটা টুকরো নিয়ে খাওয়া শুরু করল। আর যখন রাত বাড়ল, তারা সবাই নিজের নিজের রুমে ঘুমোতে চলে গেল।

বিছানায় শোওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটার চোখের পাতা বন্ধ হয়ে গভীর ঘুম এল। কিন্তু মাঝরাতে এক অস্বস্তিকর শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। শব্দটা রাস্তার ওপাশ থেকে আসছিল। একটা অমানবিক গলার স্বর ছেলেটার নাম ধরে ডাকছে আর অনবরত মৃদু আক্ষেপ গর্জনে বলে চলেছে- “আমার আঙুল কোথায়?”

ছেলেটা এসব শব্দে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। তবু সে ভাবল- “ও তো জানে না আমি কোথায় আছি, তাই ও আমাকে কক্ষনো খুঁজে পাবে না।”

তক্ষুনি সে আবার ওই হিংস্র গর্জন শুনতে পেল। এবার আরো কাছ থেকে।

গায়ের চাদর মাথা পর্যন্ত ঢেকে নিয়ে চোখ বন্ধ করে সে মনে মনে বলতে লাগলো- “এ সবই স্বপ্ন। ঘুম ভাঙলে এসব আর কিছুই থাকবে না।”

হলও তাই। সেই একঘেয়ে শব্দ কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধ হয়ে গেল। ছেলেটা গায়ের চাদর ঝুঁড়ে ফেলে একচুটে তার বাবা মায়ের রুমের দিকে দৌড় দিল। রুমের দরজা খুলে দেখল ওর বাবা মা শুয়ে আছে। টেবিল ল্যাম্প অন করে বিছানার কাছে গিয়ে চাদরটা তুলতেই সে যা দেখল তাতে তার রাতের ঘুমভাব কেটে গেল। তার বাবা মা দুজনেই চিত হয়ে শুয়ে চোখদুটো যেন ঠিকরে বাইরে বেরিয়ে আসছে। দুজনের মুখে একটা তীব্র ভয়ের ভাব।

আর তাদের পেটদুটো মাঝবরাবর কেউ যেন হাত তুকিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছে। গোটা বিছানায়
রঞ্জ এদিক ওদিক ভরে গেছে। এবার তা বিছানার পাশ থেকে পায়া গড়িয়ে পড়তে লাগল।

চেলেটার চোখদুটোয় জল নামল। বাবা মা দুজনের আর কেউই বেঁচে নেই। সে কি করবে
ভেবে পাচ্ছে না। তার চিংকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

এমন সময় দরজার দিক থেকে একটা হিসহিসে ঘষে ঘষে চলার শব্দ তার প্রায় পেছনে এল
দাঁড়াল। আতঙ্কে ছেলেটির সারা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এল। পেছন ফিরে দেখার ইচ্ছে তার
একটুও নেই। তাও তার চোখ যেন আপনাআপনি চলে গেল সেদিকে। দেখল একটা লম্বা
কিন্তু তকিমাকার কালো অপচ্ছায়া ঘরের মধ্যেখানে এসে দাঢ়িয়েছে। তার চোখদুটো
অন্ধকারে ধূকধূক করে জ্বলছে। মুখ দিয়ে অস্ফুট গর্জনের মতো শব্দ বেরিয়ে আসছে। আর
ওর বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলে নেই!! তাই ও এক পায়ে ঘষে ঘষে চলছে।

এবার অন্ধকারের ওদিক থেকে সেই দানবীয় অবয়ব খসখসে গলায় বলে উঠল-

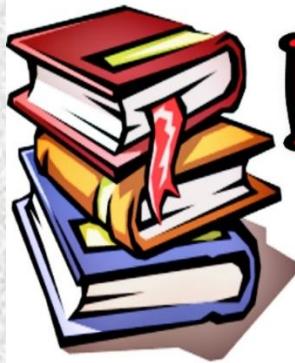
“আমার আঙুল কোওওওথাআআআআয?????”

চেলেটা এবার ভয়ে চিংকার করার জন্য মুখ খুলতেই সেই খোঁড়া পিশাচ লম্বা সরু কালো
কাঠির মতো নখা আঙুলসহ হাত তুকিয়ে দিল ছেলেটার মুখের কালো অন্ধকার গর্তে আর
সঙ্গে সঙ্গে তার পেট ফেটে বেরিয়ে এল সদ্য গেলা সেই কাটা বুড়ো আঙুল।

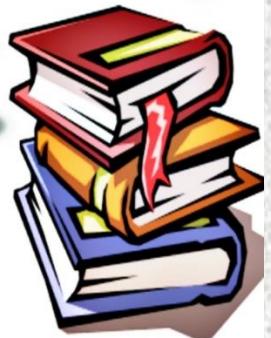


(সমাপ্ত)

STUDENT CHOICE, ADRA



BOOK STORE



ADDRESS - ADRA MARKET, STATION ROAD

OWNER

JOYDEEP MUKHERJEE (ROMI)

CONTACT - 9749810710

E-mail id :

<mailto:ardraemagazine@gmail.com>

মূল্য : মাত্র ১৫ টাকা